অস্পৃশ্যতার রাজনীতি

সুব্রত রাহা

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ASPRISYATAR RAJNITI

A Collection of Essays on Indian Casteism

by Subrata Raha.

☐ প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৮৪

☐ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা । মডার্ন কলাম । ১০/২ এ, টেমার লেন, কলি-৯

☐ মুদ্রাকর : ঘণ্টেশ্বর চক্রবর্তী ও অশোক পাল । মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬৬বি, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

☐ প্রচ্ছদ : গণেশ পাইন

অগ্রজপ্রতিম শান্তিচন্দ্র রায়চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

সুদূর ঐতিহাসিককাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে মানুষ বহুলাংশে তার চিত্তের বন্ধনমুক্তি ঘটিয়েছে, কিন্তু জাতপাতের মতো একটি সামাজিক ব্যাধির জীবাণু নিশ্চিহ্ন হয়নি। বর্ণ-ব্যবস্থার যত সুফল ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য থাক না কেন, আসলে এই ব্যবস্থার মূলে ছিল গোষ্ঠীস্বার্থের সামাজিক অনুশাসন। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত খুব স্পষ্ট ভাষায় একথা স্বীকার করেছেন। মনুসংহিতায় হিন্দুসমাজের জীবনচর্যার প্রায় প্রতিটি দিক সম্পর্কে যেমন বিচিত্র বিধান আছে, তেমন আছে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতার প্রসঙ্গে অমানবিক বিচিত্রতর বিধান। অনেক স্মৃতিশাস্ত্রে ঘৃণার আবহ আছে।

এই গ্রন্থে লেখক কিছু কিছু শাস্ত্রীয় বিধানের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। বাংলার সঙ্গে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মৌলিক পার্থক্য ও বৈপরীত্য এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সাম্প্রতিককালে ভারতে একটি জটিল সমস্যা জাতপাত থেকে উদ্ভূত সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবাদ।

আবহমানকাল থেকে জাতপাত অস্পৃশ্যতার রাজনীতিরই রূপান্তর। লেখক অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপটি কয়েকটি নিবন্ধে উপস্থাপিত করেছেন। হরিজনের মানবাধিকার আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ও ডঃ আম্বেদকরের ভূমিকার আলোচনা আলোচ্য বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকের পক্ষে উপকারী।

একজন সাংবাদিক হয়েও লেখক গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে ভারতীয় হিন্দুসমাজের সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবাদ বা জাতপাতের উৎস সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষায় সামাজিক ইতিহাস পাঠে যাঁদের আগ্রহ আছে, আশা করি, এ বই তাঁদের কাছে উপেক্ষিত হবে না।

ইন্দ্রমিত্র

বিষয়সূচী

বাঙালি ব্রাহ্মণ	৯
বাংলার ছত্রিশজাত	২১
'সৎ' ও 'অসৎ' শূদ্রের ভেদাভেদ	২৭
বাংলার ম্লেচ্ছ ও ভিন প্রদেশী অন্ত্যজ	৩৩
জাতিভেদ কি বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিরোধী ?	৩৮
শাস্ত্রীয় বিধান : দরিদ্র, অজ্ঞ এবং বঞ্চিত নিম্নবর্ণ	৪৩
খাদ্য, পানীয় এবং সহবাস প্রসঙ্গে বিচিত্র বিধান	৪৯
প্রাচীন ভারতে যৌন ব্যভিচার ও বিচিত্র বিবাহ বিধানে জাতপাত	৫৭
হিন্দু সমাজে জাতপাতের উৎসমুখ	৬৩
জাতপাতের বন্ধনমুক্তিতে বাংলার বৈষ্ণব সমাজ	৭০
লালন কি জাত সংসারে	৭৭
স্বামী বিবেকানন্দর চোখে ভারতের জাতিভেদ	৮৪
ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিশ্লেষণে হিন্দু সমাজে জাতপাত	৮৯
বাংলার লোকধর্মে জাতপাতের প্রতিবাদ	৯৫
জাতপাতের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের সন্ত সাধক (উত্তর ভারত)	১০১
ভারতের ভক্তিধর্মে জাতপাতের প্রতিবাদ	১০৭
অস্পৃশ্যতার রাজনীতি	১১৩
অস্পৃশ্যতার রাজনীতি : সমকালীন সংবাদপত্রের দর্পণে	১১৯-১২৮

বাঙালি ব্রাহ্মণ

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে হিন্দুসমাজের চতুর্বর্ণ সম্পর্কে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, সেই বিরাট বিশ্বদেবতার 'ব্রাহ্মণ মুখ ছিলেন, রাজন্য (ক্ষত্রিয়) বাহুস্বরূপ ছিলেন, উরু বৈশ্য ছিলেন এবং পদদ্বয় থেকে শূদ্র জাত হয়েছিলেন।' ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতিকে বর্ণ বলা হয়েছে, জাতি নয়। ঋগ্বেদের এই মন্ত্র সম্পর্কে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসুর বক্তব্য হল, 'ঋগ্বেদের উল্লিখিত মন্ত্রের সরল অর্থ করিলে মনে হয়, চারিটি বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং বিভিন্ন কর্মবিশিষ্ট বর্ণের সমাবেশের দ্বারা সমগ্র সমাজদেহ গঠিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বিভিন্ন মাত্রার সংযোগের ফলে চারি বর্ণের মধ্যে গুণের তারতম্য দেখা যায়। বর্ণগুলি যে শুধু নর সমাজেই আবদ্ধ তাহা নহে. ভূমি ও মন্দিরের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বিভিন্ন শ্রেণীভেদ আছে, ইহা অনেকের নিকটেই হয়তো অজ্ঞাত নহে।' ('হিন্দু সমাজের গড়ন,' পৃঃ ৬৬)

এই বর্ণাশ্রম প্রথা ও অভ্যাস যুক্তিপদ্ধতিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যেসব স্মৃতিশাস্ত্র গ্রন্থের লেখক, পণ্ডিতরা বলেন তাঁদের সঙ্গে নাকি বাঙালি সমাজের কোন যোগ ছিল না। এমনকী এই চতুর্বর্ণপ্রথা অলীক উপন্যাস একথাও নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে। তাঁর মতে, 'ভারতবর্ষে এই চতুর্বর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল ; প্রত্যেক বর্ণ, জন, কোমের ভেতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর উপস্তর। ধর্মসূত্র ও স্মৃতিকাররা নানা অভিনব অবাস্তব উপায়ে এই বিচিত্র বর্ণ ও জন ও কোমের স্তর উপস্তর ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিতে এবং সবকিছুকেই আদি চতুর্বর্ণের কাঠামোর যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রঘুনন্দন পর্যন্ত এই চেষ্টার কখনও বিরাম হয় নাই।......প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থগুলির একটিও বাঙলাদেশে রচিত নয়, কাজেই বাঙলার বর্ণবিন্যাসগত সামাজিক অবস্থার পরিচয়ও তাহাতে পাওয়া যায় না, আশা করাও অযৌক্তিক এবং অনৈতিহাসিক।...'

আমরা ইতিহাসের দর্পণে দেখতে পাই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা শুরু হয় গুপ্তযুগে। এই যুগে হিন্দুধর্মকে শাশ্বত ও সনাতন বলে ঘোষণা করা হয়। ঋগ্বেদের যুগে যে ব্রহ্ম ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে আর্যদের কোন ধারণাই ছিল না, এই যুগের ব্রাহ্মণরা সেই ব্রহ্ম ও পুনর্জন্ম নিয়ে মাতামাতি শুরু করে দেন। উপনিষদে 'ব্রহ্ম'র উল্লেখ আছে। সে 'ব্রহ্ম' বিশ্বচেতনার নির্বিশেষ রূপ। এছাড়া 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত', পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজও এই সময় শেষ হয়। এই লিপিবদ্ধ করার সময় অনেক অলৌকিক ও অপ্রাকৃত ঘটনার সংযোজন বাল্মীকি ও বেদব্যাসের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। বেদব্যাস যে মহাভারত রচনা করেন তার শ্লোক সংখ্যা ছিল মাত্র পঁচিশ হাজার। গুপ্তযুগে সঙ্কলিত মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা হয় এক লক্ষ। অবশ্য অনেকে বলেন মোট পাঁচ লক্ষ শ্লোক ছিল, চার লক্ষ লুপ্ত হয়েছে, এক লক্ষ প্রচলিত আছে। গুপ্তযুগেই পুরাণগুলি লেখা হয়। পণ্ডিতদের মতে এই গুপ্তযুগেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সঙ্কীর্ণমনা ব্রাহ্মণরাই ভারতের সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রের যথেচ্ছ বিকৃতি সাধন করেন। বেদ ও বেদান্ত ঋষি মনে প্রকাশিত ঐশী বাণী, তাই এগুলির বিকৃতি সাধনে এই ব্রাহ্মণ্যসমাজ সাহসী হননি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ব্রাহ্মণগণের সঙ্কীর্ণমনের আরেকটি উদাহরণ হল বৃহস্পতির চরিত্রহনন। যার প্রভাবে আজও আমাদের সমাজে হীনবুদ্ধির মানুষকে 'বুদ্ধির বৃহস্পতি' বলে উপহাস করা হয়। কিন্তু ঋগ্বেদে বৃহস্পতির প্রশংসাসূচক অজস্র ঋক্ আছে। যেহেতু বৃহস্পতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী ছিলেন তাই হীনমতির পুরাণকাররা 'ব্রহ্মবৈবর্ত' পুরাণে মহাভারতের একটি গাঁজাখুরি গল্পের উপর ভিত্তি করে বৃহস্পতিকে লম্পট হিসাবে চিত্রিত করেছেন। গল্পটির সারমর্ম হল, অঙ্গিরা ঋষির জ্যেষ্ঠপুত্র উতথ্যের পত্নী মমতা যখন গর্ভবতী তখন উতথ্যের অনুজ বৃহস্পতি জোর-পূর্বক মমতার সঙ্গে রতিক্রীড়ায় মিলিত হলেন। রেতঃস্খলনের পূর্বে গর্ভস্থ ভ্রূণ বলে, 'হে বৃহস্পতি, তুমি রেতঃপাত বন্ধ কর—আমি গর্ভে আছি।' চরম উত্তেজনার সুখে বাধা পেয়ে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রূণকে অভিশাপ দেন, 'তুমি দীর্ঘতমঃ হবে', অর্থাৎ জন্মের পর দীর্ঘকাল অন্ধ থাকবে। সেই জন্যই দীর্ঘতমা ঋষি দীর্ঘকাল অন্ধ ছিলেন। (মহাভারতম্-আদিপর্ব ১০৪/৮-২০ শ্লোক)

ঋগ্বেদে দীর্ঘতমা বা তাঁর পুত্র কক্ষিবানের ঋকে একথার কোন উল্লেখ

নেই। কক্ষিবান দূর থেকে বৃহস্পতির সোমলতা পেষণের ঘর্ঘর শব্দ শুনতে পেয়েছিল। শুধু তাই নয় পুরাণকারের হাতে বৃহস্পতির এই পাপের ফলস্বরূপ স্ত্রী তারা চন্দ্র কর্তৃক অপহৃতা হন এবং চন্দ্রের দ্বারা তারার গর্ভসঞ্চার হয়। এছাড়া ব্রাহ্মণ শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা বেদে শূদ্রের অনধিকার প্রমাণ করার জন্য বেদান্তসূত্রের শূদ্রের অর্থ শোকার্ত করেছে। চণ্ডালিনীর পৌত্র, জেলেনির পুত্র বেদব্যাসের পক্ষে কখনই শূদ্রবিদ্বেষ সম্ভব নয়। শৌনকের আমল থেকে যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তা স্তব্ধ হয়নি, গুপ্ত যুগ থেকেই কঠোর জাতিভেদ প্রথা চালু হয়।

ভারতে পাশাপাশি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রায় সহাবস্থান ছিল। বুদ্ধদেব আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহী সুরে বলেছিলেন 'ধম্মপদ' গ্রন্থে, 'জটাজুট পরিধান দ্বারা গোত্রদ্বারা এবং জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যিনি চারি আর্যসত্য ষোড়শ প্রকার দর্শন করিয়াছেন ও নব লোকোত্তর ধর্ম পরিজ্ঞাত তিনি শুচি এবং তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ—২৬/১১। ব্রাহ্মণের কুলগত অধিকার স্বরূপ মর্যাদা ভিক্ষার প্রতিবাদাই ছিল বুদ্ধের উদ্দেশ্য।

বাংলা ও বৃহদ্ধর্মপুরাণ

উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের আচারসর্বস্ব বেদ পারঙ্গম ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সমাজের সঙ্গে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির মানচিত্রের রঙ একটু ভিন্ন মনে হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ঐতিহাসিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্প্রর্কে নানা প্রশ্ন আছে। তবু বৃহদ্ধর্মপুরাণে পদ্মা ও বাংলার যমুনা নদীর উল্লেখ, গঙ্গার তীর্থ মহিমা উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের মাছ-মাংস খাওয়ার বিধান (যা ভারতের আর কোথাও বিশেষ নেই), ব্রাহ্মণেতর সমস্ত শূদ্রবর্ণের ছত্রিশটি উপ ও সঙ্কর বর্ণে বিভাগ (বাংলায় তথাকথিত 'ছত্রিশ জাত' যা ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না) প্রভৃতি দেখে মনে হয় পুরাণকার বাঙালি না হলেও বাংলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল।

বল্লাল-চরিত

বল্লাল-চরিত নামে দুইটি গ্রন্থের দুইজন লেখক। একজন আনন্দভট্ট, নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁর আদেশে তাঁর গ্রন্থটি লেখা হয়। তিনি ছিলেন দক্ষিণাগত ব্রাহ্মণ। অন্যটি গোপালভট্টের, তিনি নাকি বল্লালের শিক্ষক

ছিলেন। এই দুই বল্লাল-চরিত নিয়ে দুই পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। পণ্ডিতদের কূট-কচালিতে না গিয়ে বল্লালি বালাই সৃষ্টির ইতিহাসটা জেনে নেওয়া যাক।

বল্লালি বালাই

সেন রাজ্যে বল্লভানন্দ নামে এক ধনী বণিক ছিলেন। উদন্তপুরীর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বল্লালসেন বল্লভানন্দের কাছে একবার এক কোটি নিষ্ক ধার করেন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর শেষ চেষ্টা করেন বল্লালসেন। যুদ্ধ জয়ের জন্য আবার বণিক বল্লভানন্দের কাছে দেড় কোটি স্বর্ণ (মুদ্রা) কর্জ হিসাবে চান। কিন্তু বণিক এবার স্বর্ণ মুদ্রা দিতে রাজি হন একটি শর্তে, তা হল এই ঋণের পরিবর্তে হরিকেলির রাজস্ব দাবি করেন। বল্লাল ক্রুদ্ধ হয়ে প্রায় বলপূর্বক বণিকদের কাছ থেকে ধনসংগ্রহ করেন। নানাভাবে অত্যাচার করেন। সৎ শূদ্রের সঙ্গে এক পঙক্তিতে আহার গ্রহণে অসম্মতি জানালে স্বর্ণবণিকদের শূদ্রের স্তরে নামিয়ে দেন বল্লাল। এছাড়া বল্লভানন্দ পাল রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে এই সন্দেহ তাঁর মনে দানা বাঁধে। কোন ব্রাহ্মণ স্বর্ণবণিকের পূজা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলে, তাদের কাছ থেকে দানগ্রহণ করলে কিংবা শিক্ষাদান করলে সেই ব্রাহ্মণ 'পতিত' হবেন। বণিকরা তখন প্রতিশোধ নেবার জন্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে সমস্ত দাসভৃত্যদের হাত করে নেন। উচ্চবর্ণের লোক তখন বিপাকে পড়েন। বল্লাল তখন বাধ্য হয়ে কৈবর্তদের জল চল-সমাজে উন্নীত করেন। মালাকার, কুম্ভকার এবং কর্মকার প্রভৃতি সৎ শূদ্রের পর্যায়ে উন্নীত হলেন। স্বর্ণবণিকের পৈতা পরা নিষিদ্ধ হল। অনেক বণিক দেশ-ত্যাগী হলেন। বল্লাল উচ্চবর্ণের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখে অনেক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে শুদ্ধিযজ্ঞের বিধান দিলেন। ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণত্ব ঘুচে গেল। তারা ব্রাহ্মণ সমাজে 'পতিত' হলেন। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে হয়ত প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু লোকশ্রুতিটি অস্বীকার করা যায় না।

কুলজী-গ্রন্থমালার ভ্রান্তিবিলাস

বাংলা দেশে কুলজী-গ্রন্থমালা সুপরিচিত। কিন্তু এই কুলজী গ্রন্থ সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রমাণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। নীহাররঞ্জন

রায় এই কুলজী গ্রন্থ সম্পর্কে খুবই সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি পট্টোলীকে অনেক বেশি ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়েছেন। আজও অধিকাংশ কুলজী পাণ্ডুলিপি আকারে পড়ে আছে এবং নানা উদ্দেশ্যে অদল-বদল করা হয়েছে এ প্রমাণও পণ্ডিতরা পেয়েছেন। নিজেদের বংশমর্যাদা লাভের জন্য অনেকে এখনও এই কুলজী গ্রন্থগুলিকে সামাজিক ইতিহাস রচনার উপাদান বলে মনে করেন।

কুলশাস্ত্রকাহিনীর কেন্দ্রে বসে আছেন আদিশূর। আদিশূর কোলাঞ্চ-কনৌজ (ভিন্নমত, কাশী) থেকে পঞ্চব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। এই সঙ্গে কৌলিন্য প্রথার ইতিহাস জড়িত। কৌলিন্য প্রথার বিবর্তনের সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের নাম জড়িত। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলজীর সঙ্গে জড়িত আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের এবং ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূরের নাম। বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলকাহিনীর সঙ্গে বর্মণ রাজ শ্যামল বর্মণ ও হরি বর্মণের নামও জড়িত।

আজও পর্যন্ত একটি ভ্রান্ত ধারণা অদ্ভুত এক যাদুপ্রভাব বিস্তার করে আছে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে, তা হল আদিশূরই নাকি প্রথম বাংলায় ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন তাঁর আগে ব্রাহ্মণ ছিল না, বেদের চর্চা ছিল না। কুলজী গ্রন্থের এই অনৈতিহাসিক তথ্যের বিরুদ্ধে যে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা যায় তা হল নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থটি। এই একটি গ্রন্থ বাঙালির জাতীয় জীবনের একমাত্র প্রামাণ্য অভিধান। উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ হলেও পঞ্চব্রাহ্মণ ও কৌলিন্যপ্রথার ভ্রান্তিবিলাস দূর করতে সাহায্য করবে। নীহাররঞ্জনের মতে, 'অন্তত পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণের কিছু অভাব ছিল না, বেদ বেদান্তচর্চাও যথেষ্টই ছিল, অষ্টম শতকের আগেই বাঙলার সর্বত্র অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসবাস হইয়াছিল। আর, অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ যেমন বাঙলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই বাঙলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থরা বাঙলার বাইরে গিয়া বিচিত্র সম্মানলাভ করিতে ছিলেন। বঙ্গজ ব্রাহ্মণদের কোনো কাহিনী কুলশাস্ত্রগুলিতে নাই, অথচ পূর্ববঙ্গেও অনেক ব্রাহ্মণ গিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে লিপি প্রমাণ বিদ্যমান। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং সম্ভবত বৈদিক ও গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বের খবর অন্যতর স্বতন্ত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতেও পাওয়া যায়। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র একান্ত ভৌগোলিক সংজ্ঞা, বৈদিক ব্রাহ্মণদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদিশূর

পূর্বলিপি প্রমাণ বিদ্যমান, আর গ্রহবিপ্রেরা তো বাহির হইতে আগত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের সম্পর্কে কুলজীর ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক এবং অনৈতিহাসিক। বৈদ্য কায়স্থদের ভৌগোলিক বিভাগ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। কৌলীন্যপ্রথার সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, অথচ এই দুই রাজার আমলে যে স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ইহাদের নিজেদের যেসব লিপি আছে তাহার একটিতেও এই প্রথা সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত মাত্র নাই, উল্লেখ তো দূরের কথা। তাহা ছাড়া এই যুগের ভবদেব ভট্ট, হলায়ুদ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অসংখ্য অপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের যেসব উল্লেখ সমসাময়িক গ্রন্থাদি ও লিপিমালায় পাওয়া যায় তাঁহাদের একজনকেও ভুলিয়াও কুলীন কেহ বলেন নাই। বল্লাল ও লক্ষ্মণের নাম কৌলিন্যপ্রথার উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত থাকিলে তাহারা নিজেরা কেহ তাহার উল্লেখ করিলেন না, সমসাময়িক গ্রন্থ ও লিপিমালায় উল্লেখ পাওয়া গেল না, ইহা খুবই আশ্চর্য বলিতে হইবে। আদিশূর কাহিনী এবং কৌলিন্যপ্রথার ব্রাহ্মণদের গাঞী বিভাগ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। গাঞীর উদ্ভব গ্রাম হইতে, যে গ্রামে যে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপন করিতেন তিনি গ্রামের নামানুযায়ী গাঞী পরিচয় গ্রহণ করিতেন। বন্দ্য, ভট্ট, চট্ট প্রভৃতি গ্রামের সঙ্গে উপাধ্যায়, বা আচার্য জড়িত হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি।' সম্প্রতি বাঙালি সমাজের পদবীর ইতিহাস চর্চার যে আবহ সৃষ্টি হয়েছে সে পরিমাণ আগ্রহ কিন্তু কুলজীগ্রন্থমালার কৌলিন্য প্রথার কুয়াশা অপসারণের জন্য দেখা যায় না। বাঙালি কুলীন ও বেদজ্ঞ পঞ্চব্রাহ্মণের কুলগৌরব কাহিনী ছত্রিশ জাতের বঙ্গভূমিতে আজও অপ্রতিহত। আজও সংবাদপত্রে শিক্ষিত কুলীন পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। কুলজি, ঠিকুজি মিলিয়ে বিয়ে দেবার ব্যাপারে অনেক তথাকথিত প্রগতিশীল পিতামাতাও কম আগ্রহী নন।

এক সময় ব্রাহ্মণদের কুলভঙ্গের অপরাধে অনেককেই সমাজে 'পতিত' হতে হত। কুলীনদের কুলই ছিল সর্বস্ব। সেই কুলগৌরবে এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একাধিক বিয়ে করে কুলীন কন্যার পিতার কুল রক্ষা করতেন। শিশুকন্যার বিয়ে হত পিতামহের বয়সী বৃদ্ধের সঙ্গে। সারা জীবন এই বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীনের মৃত্যুতে অন্তত দশ গ্রামের দশজন বিধবা হত। গঙ্গাজল আর গোবর নিয়েই অনেক বিধবার জীবন কাটত। এছাড়াও ছিল নানা পদ্ধতিতে 'পতিত' করার ষড়যন্ত্র। যা আমরা ঠাকুর পরিবারের

ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখতে পাব।

—'রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগের কথা হচ্ছে কলিকাতায় ঠাকুর পরিবারের আবির্ভাব কাহিনী। একটু গোড়া ঘেঁসে সংক্ষেপে বলি। ঠাকুরগোষ্ঠীর আদি-পুরুষ জগন্নাথ কুশারী পীরালি ব্রাহ্মণ শুকদেব রায়চৌধুরীর এক কন্যাকে বিবাহ করে দক্ষিণডিহি (খুলনা) গ্রামের ভূসম্পত্তি পেয়ে সেখানেই বাস করতে থাকেন, পীরালি ঘরে বিবাহ করে জগন্নাথ সমাজে হলেন 'পতিত'। তুর্কী পাঠানদের শাসনকালে মুসলমানদের সংস্পর্শে আসার জন্য অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ 'পতিত' হন। রায়চৌধুরীদের সম্বন্ধে সেইরকম কাহিনী প্রচলিত আছে।

'জগন্নাথের কয়েক পুরুষ পরে পঞ্চানন ও তাঁর কাকা শুকদেব পারিবারিক মনোমালিন্য হেতু একদিন দক্ষিণ ডিহি থেকে নৌকা করে চলে এলেন কলিকাতায়। জীবিকার জন্য ভাবনা নেই—ইংরেজ বণিকরা জাহাজে করে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করেছে সেখানে।

'কুশারীরা এসে ঘর বাঁধলেন গোবিন্দপুর গ্রামে, দরিদ্র হিন্দুসমাজের হরিজন পল্লীতে সেখানে এতদিন এক ঘরও ব্রাহ্মণ ছিল না। লোকেরা তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পেয়ে খুব খুশি। খুলনায় এঁরা ছিলেন পতিত পীরালি, এখানে তাঁরা হলেন 'ঠাকুরমশাই' ব্রাহ্মণ তো বটে।' (রবীন্দ্রজীবনকথা / প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৪) গরু, গঙ্গা আর ব্রাহ্মণ সম্পর্কে হিন্দুমনে এমন এক দুর্বলতা ছিল যার স্পর্শে সর্বপাপমুক্তি, তাই এই তিনবস্তু কখনই কোন কারণে মূল্যহীন হয়ে পড়ে না।

বাঙালি ব্রাহ্মণের উৎস সন্ধানে

ঐতরেয় আরণ্যকে 'বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেয় পদা' এই পদে অনেকেই বঙ্গ, মগধ, চের, এবং পাণ্ড্য কোমের উল্লেখ আছে বলে মনে করেন। এইসব কোমকে বয়াংসি বা 'পক্ষী বিশেষাঃ' এবং এরা যে আর্য সংস্কৃতির বহির্ভূত তাও ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে পুণ্ড প্রভৃতি জনপদের অধিবাসীকে দস্যু বলা হয়েছে। প্রচীনকালে আর্যভাষীরা তখন পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচিত হননি। পরবর্তীকালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদি রচনায় তাঁরা শুধুমাত্র পুণ্ড, বঙ্গ প্রভৃতি কোমের নামমাত্র শুনেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি গল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঋষি বিশ্বামিত্র একটি ব্রাহ্মণ বালককে পোষ্যপুত্র-

রূপে গ্রহণ করেন; দেবতার প্রীত্যর্থে যজ্ঞে বালকটিকে আহুতি দেবার আয়োজন হয়েছিল। সেই যজ্ঞভূমি থেকেই বিশ্বামিত্র বালকটিকে উদ্ধার করে আনেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের পঞ্চাশটি পুত্র পিতার এই পোষ্যপুত্রকে ভালভাবে গ্রহণ করেনি। বিশ্বামিত্র এ ব্যাপারে পুত্রদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিসম্পাত দেন যে তাঁদের সন্তানরা যে উত্তরাধিকার লাভ করবে তা একেবারে পৃথিবীর প্রান্তিক সীমায় (বিকল্পে তাঁদের বংশধরেরা একেবারে সর্বনিম্ন বর্ণপ্রাপ্ত হবে)। এরাই 'দস্যু' আখ্যাত অন্ধ্র, পুণ্ড, শবর, পুলিন্দ এবং মুতিব কোমের জন্মদাতা। এই গল্পের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমরা মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে পাই। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বাংলায় সমুদ্রতীরবাসী কোমগুলিকে বলা হয়েছে 'ম্লেচ্ছ'। ভাগবত পুরাণে কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, যবন, খস এবং সুহ্ম কোমের লোকদের বলা হয়েছে 'পাপ।' এইসব জনপদে কেউ অল্পকাল বাস করলেও তাকে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চোখে বাংলাদেশ ছিল অবজ্ঞাত এবং ঘৃণিত।

এছাড়াও ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নানা আচারসর্বস্ব ধর্মাচরণ যা আজও ছত্রিশ জাতপাতের বাঙালি সমাজে খুব একটা প্রাধান্য লাভ করেনি। নির্মলকুমার বসু এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে কতকগুলি গুণকে উত্তম কতকগুলিকে অধম বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কুক্কুট শূকর ইত্যাদি হেয় বস্তু মৎস্যজীবী হেয় জাতি, গর্দভ পালক হেয় জাতি, কিন্তু গোপালক, অশ্ব-পালক শুদ্ধ। চর্মজীবী অশুদ্ধ। রেশমী বস্ত্র শুদ্ধ কিন্তু কার্পাসজাত অপেক্ষাকৃত অশুদ্ধ। কেনই বা কোনো বিশেষ বৃত্তিকে শুদ্ধ এবং অপর কোন বৃত্তিকে অশুদ্ধ বিবেচনা করা হইত, তাহা উপস্থিত আমাদের বিবেচনার বিষয় নহে। উপস্থিত শুধু এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির মানদণ্ড অনুসারে সমাজে বিভিন্ন জাতির পদ নির্ণয় করা হইত! হেয় জাতির মধ্যে কাহাকেও স্পর্শের অযোগ্য, কাহাকেও বা দর্শনের পর্যন্ত অযোগ্য মনে করা হইত। ('হিন্দুসমাজের গড়ন' পৃঃ ৬৯-৭০) এখন দেখা যাক বাংলাদেশের মত এক অবজ্ঞাত ম্লেচ্ছ ও 'পক্ষী'র দেশে আর্যসমাজের প্রতিভূ ব্রাহ্মণের পদার্পণ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সম্প্রসারণ কিভাবে হল? প্রথমেই কুলজীগ্রন্থের ভ্রান্তিবিলাস ত্যাগ করে লিপিমালা ও সাহিত্য উপাদানের সাহায্য নেওয়া যাক।

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনপদই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সমাজ উত্তর ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণ্য বর্ণ ব্যবস্থার ছকে বাঁধা পড়ে।

লিপিমালাই সে যুগের অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে।

গুপ্তযুগে অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া যায় বিভিন্ন পণ্ডিতের রচনায়। বিভিন্ন পট্টোলীতে ব্রাহ্মণদের ভূমি ক্রয় ও মন্দির নির্মাণের তথ্য পাওয়া যায়। পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্বীকৃতিলাভ করেছে এবং এই ধর্মের দেবদেবী পূজিত হচ্ছেন। অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করছেন। অযোধ্যাবাসী ভিন প্রদেশীরাও এখানে এসে মন্দির সংস্কারের জন্যে ভূমি ক্রয় করছেন। ব্রাহ্মণরা সকলেই বাজসেনীয়, ছান্দোগ্য, বাহবুচা, চারক্য এবং তৈত্তিরীয় এই পাঁচ বেদ পরিচয়ের অন্তর্গত, তবে যজুর্বেদীয় ও বাজসেনীয় পরিচয়ই বেশি। শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভূতিবর্মা ভিন্ন ভিন্ন বেদের ৫৬টি বিভিন্ন গোত্রীয় অন্তত ২০৫ জন বৈদিক বা সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণের বসতি করিয়েছেন।

বিজয় সেনের মল্লাসারুল লিপিতে (ষষ্ঠ শতক) জানা যায় যে দৈনিক পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিষ্পন্নের জন্য মহারাজা বৎসস্বামী নামে জনৈক ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণকে কিছু ভূমি দান করেছেন। মধ্য ও পূর্ববঙ্গে এইরূপ আরও অনেক পট্টোলীতে ব্রাহ্মণের ভূমিক্রয় ও অব্রাহ্মণের ভূমিদানের খবর পাওয়া যায়। শশাঙ্ক বারোজন ব্রাহ্মণ সরস্বনদীর তীর থেকে নিয়ে আসেন। এমন একটি গল্প নদীয়া বঙ্গসমাজের কুলজীগ্রন্থে আছে। শশাঙ্ক এক উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। আরোগ্যলাভের আশায় গৃহযজ্ঞ করার জন্যই ব্রাহ্মণদের আনেন শশাঙ্ক। পরে রাজার অনুরোধে এইসব ব্রাহ্মণরা গৌড়ে বসবাস আরম্ভ করেন এবং গ্রহবিপ্র নামে পরিচিত হন।

সিদ্ধল গ্রামে সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বসতির কথা বর্মণ রাজ হরিবর্মা দেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের লিপিতে পাওয় যায়। এই লিপিতে সমসাময়িক-কালের ভাবাদর্শ সমাজ ও শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ভবদেবের মা বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ কন্যা। এই সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের 'গাঞী' পরিচয় বিভাগ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। ভবদেব ভট্ট সমসাময়িক বাঙালি সমাজে চিন্তানায়কদের অন্যতম। তিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিদ, সিদ্ধান্ত তন্ত্র গণিত ফলসংহিতায় সুপণ্ডিত। হোরাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থের তিনি লেখক, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। রাঢ়দেশে তিনি একটি নারায়ণ মন্দির স্থাপন করে তাতে নারায়ণ, অনন্ত নৃসিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী কালে ভবদেবের উক্তি ও বিচার বারবার উল্লেখ করে সমাজশাসনে বাঙালি ব্রাহ্মণ জাত্যভিমান বজায় রেখেছে।

বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচর্যার ও ক্রিয়া কর্মের বিধান, বিধি নিয়ম সুনির্দিষ্ট সূত্রে গ্রন্থিত করেন ভবদেব। বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, বিভিন্ন বর্ণে স্তর উপস্তর প্রত্যেকের পারস্পরিক আহার-বিহার, বিবাহ-ব্যাপার, নানা বিধিনিষেধ সবই ভবদেব ভট্টের তৈরি। ভবদেব ভট্ট পালযুগের শেষ আমলের লোক, এই সময় থেকেই একান্তভাবে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজ শাসনের সূচনা ও ভবদেব ভট্টই তার আদিগুরু। বর্মণ রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোকতায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রসারও কিছুটা প্রতিপত্তি বিস্তার শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও সমর্থনে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই শাসনের প্রথম কেন্দ্রস্থল একদিকে রাঢ়দেশ এবং কিছু পরে আর একদিকে বিক্রমপুরে।

ধর্ম শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচনাকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণ্য সমাজের সংরক্ষণী মনোভাব বাংলায় আত্মপ্রকাশ করে। আদি ধর্মশাস্ত্র লেখক জিতেন্দ্রিয় ও বালকের কোন রচনার নাকি সন্ধান আজ আর পাওয়া যায় না বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। কিন্তু শুভাশুভকাল, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি সম্পর্কে এই দুই জনের মতামত উল্লেখ করেছেন জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন প্রমুখ বাঙালি স্মার্ত ও ধর্মশাস্ত্র লেখকরা।

কিন্তু স্মৃতি-ব্যবহার-ধর্মশাস্ত্র রচয়িতাদের মধ্যে বাংলায় লক্ষ্মণসেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ বিশেষভাবে আদৃত। হলায়ুধের এক ভাই ঈশান আহ্নিক পদ্ধতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অন্য ভাই পশুপতি শ্রাদ্ধপদ্ধতি ও পাকযজ্ঞ সম্বন্ধে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। এইসময় রচিত ব্যবহার ও স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের সংরক্ষণ মনোভাবের কিছু বাদ পড়েনি। যেমন দন্তধাবন, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজানুষ্ঠান ক্রিয়াকর্মের শুভাশুভ কালবিচার, অশৌচ, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিচিত্র অপরাধ ও তার শাস্তি বিধান, কৃচ্ছ্র, তপস্যা, গর্ভাধান, পুংসবন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন, সম্পত্তি বিভাগ, আহার বিহারের বিচিত্র বিধিনিষেধ, বিবৃতি, দানের বিবৃতি দান কর্মের বিচিত্রতর বিধিনিষেধ, তিথিনক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার, দৈবিক, বায়বিক ও পার্থিব বিচিত্র উৎপাত, লক্ষণাদির শুভাশুভ নির্ণয়, বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র পাঠের নিয়ম ও কাল, এক কথায় বাঙালি দ্বিজবর্ণের জীবনশাসনের কোন নির্দেশই বাদ পড়েনি।

ব্রাহ্মণতান্ত্রিক বর্ণব্যবস্থার শীর্ষস্থানে যে ব্রাহ্মণরাই থাকবেন এতে কোন ভাবেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ সমাজ রক্ষকরাই সমাজের ভক্ষক

হন। নানা গোত্র প্রবর ও বিভিন্ন বৈদিক শাখার ব্রাহ্মণরা যে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শতক থেকেই উত্তর ভারত থেকে বাংলায় এসেছেন একথা বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন।

কুলীনদের বহুবিবাহ

'কুলীনদের বহু বিবাহ বিষয়ে অনেকবার সকলকে জ্ঞাপন করা গিয়াছে এবং ঐ কুব্যবহারেতে কি পর্যন্ত দুঃখ জন্মে তাহাও বিলক্ষণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় কোন ২ সম্বাদপত্র সম্পাদকেরা লিখিয়াছেন যে এতদ্রূপ বহুবিবাহ এইক্ষণে প্রায় নাই। আমরা পুর্বেই জ্ঞাত ছিলাম যে এই কথা নিতান্ত অমূলক এবং এইক্ষণে জ্ঞানান্বেষণ হইতে নীচে লিখিতব্য বিবাহিত কুলীনদের নামের ফর্দ্দ ও তাঁহাদের বাসস্থান ও কে কত বিবাহ করিয়াছেন তদ্বিবরণ অর্পণ করাতে পূর্ব্বোক্ত অপহ্নবের কথা বিলক্ষণ প্রামাণিকই হইল।

আমরা এস্থলে কএক জন কুলীনের নাম ও তাঁহারা কে কত বিবাহ করিয়াছেন তাহাও লিখিতেছি ইহাতে জানিতে পারিবেন এক ২ জন কুলীন কত সংখ্যক বিবাহ করিয়া কত ২ স্ত্রীলোকের সুখের কণ্টক হয়।'

গ্রাম	নাম	বিব
ময়নাপাড়া	রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬২
জয়রামপুর	নিমাই মুখোপাধ্যায়	৬০
আড়ুয়া	রামকান্ত বন্দ্য	৬০
মালগ্রাম	দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	৫৩
নগর	খুদিরাম মুখ	৫৪
বলুটী	দর্পনারায়ণ মুখ	৫২
	নয়কড়ী বন্দ্য	১৮
সিঙ্গী	কৃষ্ণদাস বন্দ্য	৪৭
ফতেজঙ্গপুর	শম্ভু চট্টোপাধ্যায়	৪০
পাঁচন্দি	রামনারায়ণ মুখ	৩৭
বিল্বগ্রাম	রাধাকান্ত বন্দ্য	৩০
কৃষ্ণনগর	কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪
	গোকুল মুখ	২৭

গ্রাম	নাম	বিবাহ
হালদামহেশ	রাধাকান্ত চট্ট	২৭
হাজরাপুর মথুর	যজ্ঞেশ্বর মুখ	২৬
সিঙ্গী	গঙ্গানন্দ মুখ	২৫
কাশীপুর	ভগবান মুখ	২২
	শম্ভু মুখোপাধ্যায়	১৭
বালী	রামজয় মুখোপাধ্যায়	২২
পানিহাটী	রামধন মুখোপাধ্যায়	১৮
পারহাট	তারাচাঁদ মুখ	১৫
চন্দ্রহাট	রাধাকান্ত ভট্ট	১৫
কইকালা	জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়	১৪
কুরুম্বা	কাশীনাথ বন্দ্য	১৩
ওআড়ী	রামকানাই চট্ট	১২
খিরগ্রাম	ত্রিলোচন মুখ	১০
পতসপুর	গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায়	৮

সমাচার দর্পণ

(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬/১২ বৈশাখ ১২৪৩)

'সমাচার দর্পণে'—এই খবর বেরিয়েছে

৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ সম্বাদপত্রে লেখে কিয়দ্দিবস হইল বালী গ্রামনিবাসি গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একশত পত্নীকে বিধবা করিয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন।

বাংলার ছত্রিশ জাত

এই পশ্চিমবাংলায় প্রায় চল্লিশ হাজার গ্রাম আর বেশ কয়েকটি বড় শহরের অধিবাসী বাঙালির মুখে আজও কথায় কথায় শুনতে পাবেন ছত্রিশ জাতের কথা। বিশেষত বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে বিধবা বা ছুঁৎমার্গী ধর্মাভিমানী মানুষ যে ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া পেলে নিজেদের অশুচি জ্ঞান করেন, সেই ছত্রিশ জাত কারা? বাঙালি সমাজে আলাদাভাবে সনাক্ত করবেন কীভাবে তাঁদের। সমাজ দেহের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে সেই ছত্রিশ জাত। বাংলার বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর সম্পর্কে খুব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে নৃতাত্ত্বিক ভাবে প্রমাণ হয়েছে আচণ্ডাল বাঙালির নরতত্ত্বের পরিচয়। বহুদিন আগে রিজলী সাহেব বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালান মোটামুটিভাবে এতদিন পর্যন্ত নৃতত্ত্ববিদরা তার উপর ভিত্তি করে গবেষণা করেছেন। বর্ণ হিন্দুদের জাত্যাভিমানের মূলে পণ্ডিতদের তত্ত্ব ও তথ্য আঘাত হানতে পারে। ভেঙে দিতে পারে রক্তের গভীরতর অসুখ জাতপাতের ভেদ।

আজও আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষের মনে লুকিয়ে আছে কুসংস্কার। টি ভি, ভি ডি ও আর আধুনিক জীবনযাপনের ইলেকট্রনিক সামগ্রীর আড়াল আবডাল থেকে মাঝে মধ্যে আমাদের সভ্যতাগর্বা মনে হানা দেয় সেই সংস্কার। এই সংস্কারই সমাজ জীবনের নিয়ামক হয়ে আছে। একজন বিদ্যাসাগর বা একজন স্বামী বিবেকানন্দ সেই অচলায়তনের পক্ষে হয়ত তেমন কিছুই নয়। সারা ভারতবর্ষেই জাতপাতের ভেদ মানুষের রুটির লড়াইকে পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে প্রতিহত করছে। যাহোক আমাদের বাঙালি সমাজের ছত্রিশ জাতের ও জাতের নামে বজ্জাতির উৎসমুখটি কোথায় দেখা যাক!

দেবতা থেকে উপদেবতার ভিড় যেমন আমাদের সমাজে বেশি, ঠিক তেমন পুরাণ থেকে উপপুরাণের শাস্ত্রকথা তত জোরদার। বৃহদ্ধর্মপুরাণ একটি উপপুরাণ। এই পুরাণের সাল তারিখ সম্পর্কে পণ্ডিতদের অনুমান খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতক অর্থাৎ তুর্কী বিজয়ের অব্যবহিত পরে রাঢ়দেশে এই পুরাণ রচিত হয়। ব্রাহ্মণ বর্ণ বাদে যে ছত্রিশটি জাত বাংলার জন জীবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

তার পরিচয় পাওয়া যায় এই উপ-পুরাণে। এই উপ-পুরাণের রচায়িতা ব্রাহ্মণেতর শূদ্র বর্ণের লোকদের তদানীন্তন বর্ণ বিভাগ অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

(১) উত্তম সঙ্কর বিভাগ: করণ (সংশূদ্র) অম্বষ্ঠ (বৈদ্য), উগ্র, মাগধ, গান্ধিক বণিক, শাংখিক, কংসকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, গোপ, দাস (চাষী), রাজপুত, নাপিত, মোদক, বারজীবী, সূত (সূত্রধর), মালাকার, তাম্বুলী ও তৌলিক। (২০)

(২) মধ্যম সঙ্কর বিভাগ: তক্ষণ, রজক, স্বর্ণবণিক, আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক (শাবার), শেখর ও জালিক। (১২)

(৩) অন্ত্যজ বা অধম সঙ্কর (বর্ণাশ্রয় বহিস্কৃত): মালগ্রাহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড়, চর্মকার, ঘণ্টজীবী বা ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী, মল্ল ও তক্ষ। (৯)

এই শ্রেণী বিভাগ ছাড়াও বৃহদ্ধর্মপুরাণ অবাঙালি ও বৈদেশিক ম্লেচ্ছ কয়েকটি কোমের উল্লেখ করেছে। যদিও বৃহদ্ধর্মপুরাণ বলছে ছত্রিশটি জাতের কথা কিন্তু উল্লেখ করছে বর্ণ উপবর্ণ মিলিয়ে একচল্লিশটির। পাঁচ উপবর্ণ পরবর্তীকালের সংযোজনা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড খুব সম্ভব বাংলাদেশে রচিত হয়েছে এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণের সমসাময়িক বলেও পণ্ডিতদের অনুমান। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও বর্ণবিন্যাস অধ্যায় বাংলায় বিভিন্ন জাতের বৃহদ্ধর্মপুরাণের অনুরূপ তালিকা পাওয়া যায়।

বর্ণ ও জনের দিক থেকে এই বিভাগ যে কৃত্রিম একথাও পণ্ডিতরা বলেছেন। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে······'একটু মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে, ইহার প্রথম দুইটি বিভাগ ব্যবসাকার্যগত এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগ দুইটি কতকটা জনগত। প্রথম বিভাগটি জলচল ও দ্বিতীয় বিভাগটি জল অচল বর্ণের বলিয়া অনুমেয়, কাজেই কি কর্মবিভাগ কি জনবিভাগ, কোনও দিক হইতেই ইহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক যুক্তি হয়তো মিলিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, স্বণকার ও স্বর্ণবণিক কেনই বা মধ্যম সঙ্কর, আর গন্ধবণিক ও কংসবণিক কেনই বা উত্তম সঙ্কর অথবা তৈলকার কেনই বা মধ্যম সঙ্কর। বস্তুত, বর্ণবিভাগ যেখানে ব্যবসায় কর্মগত সেখানে প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেই বিভিন্নজনের বর্ণ আত্মগোপন করিয়া থাকিবেই। বর্ণগুলি সেই জন্যই সঙ্কর এবং স্মৃতি ও পুরাণে বার বার যে বর্ণসঙ্কর ও জাতিসঙ্করের কথা বলা হইয়াছে ইহার ইঙ্গিত ইতিহাস ও নরতত্ত্বের দিক হইতে নিরর্থক ও অযৌক্তিক নয়। ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে সাংকর্যের

কথা যে বলা হয় নাই তাহার কারণ হয়তো এই যে, এইসব পুরাণ স্মৃতি প্রাগ্রশ তাঁদেরই রচনা, অথচ নরতত্বের দিক হইতে দেখা যাইবে যে এই জাতিসাংকর্য অম্বষ্ঠ ও করণদের সম্বন্ধে যতখানি সত্য ঠিক ততখানি সত্য ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধেও। নরতাত্বিক বিশ্লেষণে এই কথাটা ভাল করিয়া ধরা পড়িবে এবং তখন দেখা যাইবে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পরিমাণ সঙ্কর, বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম ও মধ্যম সঙ্কর বিভাগের অধিকাংশ বর্ণই সেই পরিমাণে এবং প্রায় একই বৈশিষ্ট্যে সঙ্কর।' (বাঙ্গালীর ইতিহাস)

জাতের নামে বজ্জাতি

ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের সঙ্কর বা জাতি সঙ্করের সম্পর্কে আমাদের সমাজ-পতিরা কখনই খুব একটা সরব হনান বরং অনেক ক্ষেত্রে নীরবে নিভৃতে খুব ঠাণ্ডা মাথায় তার বিধান দিয়েছেন। উচ্চবর্ণের মানুষ উচ্চবিত্তের অধিকারী না হয় বিত্তশালার অনুগ্রহজাবা ও প্রী।তভাজন থাকার ফলে কোন ।দন তাদের অপরাধ ও অপকর্মকে বড় করে দেখা হয়নি। জামূতবাহন মনুর মতকে সমর্থন করে ব্রাহ্মণের স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে বলেছেন যে, যজ্ঞ ও ধমানুষ্টানে ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রাই অধিকারী। সবর্ণা স্ত্রী না থাকলে ক্ষত্রিয় স্ত্রী যজ্ঞভাগা হতে পারেন। কিন্তু বৈশ্য বা শূদ্র নারা ব্রাহ্মণের বিবাহিত হলেও স্ত্রার অধিকার পাবেন না। আরও বিচিত্র ভণ্ডামির সন্ধান মেলে জামূতবাহনের টিপ্পনিতে, তা হল ব্রাহ্মণ শূদ্রাণার গর্ভে সন্তানের জন্মদান করলে তাতে কোন নৈতিক অপরাধ হয় না, স্বল্প সংসর্গ দোষ তাকে স্পর্শ করে মাত্র, এবং নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করলেই সে অপরাধ কেটে যায়। প্রসঙ্গত মনে পড়ে মাইকেল মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র নকশার সেই কাম-লোলুপ জমিদারের শিবমন্দিরের মধ্যে যবনা-যুবতার প্রতি আসক্তির কথা। এঁরা আবার সমাজের স্পর্শ দোষ ও বর্ণ সঙ্করের বিধান ।দতেন ভট্টাচায্যি চক্কোবর্ত্তী বামুনের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে।

আহার-বিহারে বিধি-নিষেধ

ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য বর্ণ উপবর্ণের আহার বিহারের বিধিনিষেধ সম্পর্কে অনেক পরস্পর বিরোধী বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। ভবদেব ভট্টের 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ'

এ সম্পর্কে প্রামাণিক ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই সমস্ত বিধিনিষেধের কিছু উল্লেখ করলে বোঝা যাবে কেন আজ তথাকথিত হিন্দুয়ানির ভণ্ডামির মুখোশ খসে পড়ছে। কয়েকটি বিধিনিষেধের নমুনাই যথেষ্ট হবে।

রজক, কর্মকার, নট, কৈবর্ত, মেদ, ভিল্ল, চণ্ডাল, পুক্কশ, কাপালিক, নর্তক, তক্ষণ, স্বর্ণকার, শৌণ্ডিক এবং পতিত বা নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্পৃষ্ট বা পক্ক খাদ্য ব্রাহ্মণদের পক্ষে খাওয়া নিষিদ্ধ। এই নিষেধ অমান্য করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। শূদ্রপক্ক খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ। কেউ নিষেধ অমান্য করলে পূর্ণ কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্তের বিধান ছিল। প্রাচীন স্মৃতিকারদের এই বিধান ভবদেব ভট্ট মেনে নিয়ে ছিলেন। তবে টিকা ব্যাখ্যা করে বলেছেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পক্ক অন্ন গ্রহণ করলে কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক পালন করলেই চলবে। আর বৈশ্যপক্ক অন্নগ্রহণ করলে তিন চতুর্থাংশ। ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রপক্ক অন্নগ্রহণ করে তাহলে তাকে পূর্ণ কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, কিন্তু বৈশ্যপক্ক অন্নগ্রহণ করলে অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করলে চলবে। আর বৈশ্যপক্ক অন্নগ্রহণ করলে তিন চতুর্থাংশ। ক্ষত্রিয় যদি শূদ্রপক্ক অন্নগ্রহণ করে তাহলে তাকে পূর্ণ কৃচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, কিন্তু বৈশ্যপক্ক অন্নগ্রহণ করলে অর্ধেক প্রায়শ্চিত্ত করলে চলবে। বৈশ্য শূদ্রপক্ক অন্নগ্রহণ করলে অর্ধেক প্রায়শ্চিত্তে চলতে পারে। শূদ্র হস্তে তৈলপক্ক ভর্জিত (শস্য) দ্রব্য, পায়স, কিংবা আপৎকালে শূদ্রপক্ক দ্রব্য প্রভৃতি ভোজনে ব্রাহ্মণের কোনও বাধা নেই। এর জন্য মনস্তাপপ্রকাশ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করলে দোষ কেটে যায়। শূদ্রের পাত্রে রাখা জল বা শূদ্রে দেওয়া জলপান ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য অল্প প্রায়শ্চিত্তে সেই দোষ কেটে যেত। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কেউ চণ্ডাল বা অন্ত্যজপৃষ্ট বা তাদের পাত্রে রাখা জল পান করতে পারতেন না। নিষেধ অমান্য করলে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। আশ্চর্যভাবে ধরা পড়ে চাতুরীগুলো, কোথাও মনস্তাপপ্রকাশ রূপ প্রায়শ্চিত্তে স্পর্শ দোষ কেটে যায়, আবার জলপানের জন্য পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। কোথাও গুরু পাপে লঘু দণ্ড আবার কোথাও লঘু পাপে গুরু দণ্ড। নট ও নর্তক বৃত্তিধারীদের সম্পর্কে নানা প্রকাশ বিধিনিষেধ ছিল।

স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ ছাড়াও চযাগীতি ও চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে আরও কয়েকটি নিম্নবর্ণ বা নীচ জাতির খবর পাওয়া যায়। যেমন, ডোম বা ডোম্ব, চণ্ডাল, শবর ও কাপালি। ডোমপল্লীর একটি বর্ণনা কহ্নুপাদের রচনায় পাওয়া যায়।

ডোমেরা নগরের বাইরে কুঁড়েঘর বেঁধে বাস করতেন এবং বাঁশের তাঁত ও চাঙাড়ি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ব্রাহ্মণের স্পর্শ বাঁচিয়ে তাঁদের চলতে হত। তবে ডোম নারী-পুরুষ অনেক ক্ষেত্রেই নৃত্যগীতে পটু হতেন। চর্যাগীতিতে তাঁদের নৃত্যগীত পটুত্বের খবর পাওয়া যায়। একাধিক চর্যাগীতিতে ডোম ও চণ্ডাল অভিন্ন কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে ডোম ও চণ্ডাল উভয়ই অন্ত্যজ ও পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখিত। সমাজের উচ্চ শ্রেণী ও বর্ণের দৃষ্টিতে এঁদের যৌনাদর্শ ও অভ্যাস শিথিল ছিল এমন সাক্ষ্য চর্যাগীতে আছে। পরবর্তী পর্বে দেখা যায় উচ্চ শ্রেণীর ধর্মকর্মকে এই শৈথিল্য স্পর্শ করেছে। পণ্ডিতদের মতে পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপের পোড়ামাটির ফলকগুলিতে বাঙালি সমাজের নিম্নস্তরের এইসব গোষ্ঠী ও কোমদের দৈহিক গঠনাকৃতি, দৈনন্দিন আচার-বিচার, বসন ব্যসনের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালি

আমরা আজও জাত বিচারে ছোট-বড় খুঁজি। পশ্চিমবঙ্গে যদিও জাত-পাতের বালাই অনেক কম, তবুও পুরনো দিনের সংস্কারের শেকড় বাকড় মাঝে মাঝে টান দেয়। আজও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছেলেমেয়ের বিয়েতে একদা-ইংরেজ প্রভুর গুণগ্রাহী পিতা সিডিউল কাস্ট পাত্র-পাত্রীতে ভ্রূকুঞ্চন করেন। কিন্তু সত্যি কি এই ধরনের কোন জাতপাতের বিচার বিজ্ঞানসম্মত? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও পোদদের দেহবৈশিষ্ট্য পরিমিতি গণনা করেছেন বিরজাশঙ্কর গুহ। পশ্চিমবাংলার কয়েকটি জেলার সাঁওতাল, ভূমিজ, বাউরী, বাগ্দী, লোহার, মাঝি, তেলি, স্বর্ণ ও গন্ধবণিক, ময়রা, কলু, তন্তুবায়, মাহিষ্য, তাম্বুলি, নাপিত, রজক ইত্যাদির গণনা করেছেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পরিমিতি নিয়েছেন তারকচন্দ্র রায়চৌধুরী এবং হারাণচন্দ্র চাকলাদার পরিমিতি নিয়েছেন কলকাতার ব্রাহ্মণ ও বীরভূমের মুচিদের। রিজলী গণনা করেছিলেন সদগোপ, রাজবংশী, মুচি, মালী, মালো, কৈবর্ত, গোয়ালা, চণ্ডাল, বাউরী, বাগ্দী এবং পূর্ববাংলার মুসলমানদের। মানেন্দ্রনাথ বসু গণনা করেছেন উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ বাংলার আটটি জেলার বুনা, নলুয়া (মুসলমান), বাঁশকোঁড়, মুচি, রাজবংশী, মালো (এই দুই বর্ণের ব্যবসা মাছ ধরা ও মাছ বিক্রি করা), কেওড়া, যুগীদের। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত, রাজবংশী, পোদ এবং বাগ্দীদের দেহবৈশিষ্ট্য, ও পরিমিতি গণনা করেছেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ।

মোটামুটিভাবে এই বর্ণ ও শ্রেণীগুলির মধ্যে বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তম, মধ্যম ও অন্ত্যজ সঙ্কর প্রতিনিধির সন্ধান মিলেছে। নমঃশূদ্র বর্ণের জনগোষ্ঠী মধ্য ও বর্তমান যুগে একটি বলিষ্ঠ বর্ণ এ তথ্য হার্টন ও রিজলীর অনুসন্ধান থেকে জানা যায়।

পরিশেষে এ তথ্য ও গবেষণার সম্মিলিত বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে দেহগঠন, চোখ, চামড়ার রং, কেশ বৈশিষ্ট্যে বাঙালি উচ্চ ও নীচ জাতি প্রায় অভিন্ন। উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যের জাত্যাভিমান এক ধরনের আত্মরতির সম্মোহন ছাড়া আর কিছুই নয়। নমঃশূদ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের নরতত্ত্বের দিক থেকে কোন পার্থক্যই নেই। শুধু মাত্র বর্ণ বিন্যাসের আর্থিক ও সামাজিক ধর্মকর্মের অধিকারই এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এরপরও কি আমরা কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি না, 'গোরুরা থাকুক গোত্র আঁকড়ে, মানুষ মিলুক মানুষের সাথে।'

'সৎ' ও 'অসৎ' শূদ্রের ভেদাভেদ

শাস্ত্রে বলেছে 'ব্রহ্ম'কে যিনি জেনেছেন তিনি নাকি ব্রাহ্মণ। তিনিই বর্ণশ্রেষ্ঠ, পুরোহিত, যাজ্ঞিক। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য অমান্য করে সৃষ্টি হয়েছে গোষ্ঠী স্বার্থ। তাই ভারতীয় সমাজ কর্মভিত্তিক বর্ণব্যবস্থার সুযোগে একদল ভোগ করবেন, আরেকদল তাঁদের সেবক হবেন। একদল বিধান দেবেন, অন্যদল তা পালন করবেন। সেই বিধান যতই যুক্তিহীন, হৃদয়হীন, কুরুচিপূর্ণ ও অমানবিক হোক না কেন, স্মৃতিশাস্ত্রকার তা ভ্রূক্ষেপ করবেন না। তা না হলে বিবাহের বয়স সম্পর্কে তাঁরা এমন উদ্ভট মত প্রকাশ করতে পারেন! পরাশর বিবাহের বিধান দিয়ে বলেছেন—'যথা সময়ে যদি মেয়ের বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহলে সেই কন্যার মাসিক রজঃ অপর জগতে পিতৃপুরুষদের পান করতে হয়, এবং তাকে যে বিবাহ করে তাকে হতভাগ্য হতে হয়।' বশিষ্ঠ, বৌধায়ন, নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য এই বিবাহের বয়স সম্পর্কে আরও বিচিত্রতর মত প্রকাশ করেছেন—'কুমারী অবস্থায় কন্যা যতবার রজঃস্বলা হবে ততবার তার পিতা, মাতা ও অভিভাবকদের ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে।' গৌতম এ সম্বন্ধে অন্যান্য স্মৃতিকারদের সঙ্গে মতৈক্য প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন, রজঃস্বলা হবার আগেই কন্যার বিবাহ হওয়া চাই।······অবশ্য বাংলায় খুব বেশিদিন এইসব উদ্ভট সামাজিক বিধান প্রশ্রয় পাইনি। বাংলায় ভাগবত ধর্মের প্রবক্তা ও সহজিয়া সাধকরা মানব মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। একা নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত তথাকথিত হিন্দুয়ানির পঙ্কিল আবর্ত প্রেম ধর্মের উদ্দীপনায় বুক পেতে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেও দ্বিজোত্তম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমস্ত ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শাস্ত্রকে শাস্ত্র করে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও অধ্যাত্ম জীবনে সর্ব মানবিক অধিকার ও সমন্বয়ের সাধনা করেছেন। রামকৃষ্ণদেব একথাও বলেছেন, 'নারকেল গাছ বড় হয় আর বেল্লেগুলো পড়তে থাকে। জাতিভেদও জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়বে।' রামকৃষ্ণের ৲ - নাই আজ ভারতীয় হিন্দু ধর্মকে এক

আন্তর্জাতিক মানবধর্মে রূপান্তরিত করেছে।

তবু বাংলার বর্ণবিন্যাসে গোষ্ঠী স্বার্থের প্রধান্য লক্ষ্য করা যায়। আজ হয়ত তার কোন গুরুত্ব নেই, কিন্তু গত শতকে ছিল।

ব্রাহ্মণ ছাড়া সমাজের প্রায় সব উচ্চ ও নীচ বর্ণ 'সৎ' ও 'অসৎ' শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত হত। ব্রাহ্মণেতর সব জাতির মধ্যেই এক বিচিত্র হীনমন্যতার জন্ম হয়েছিল। তাই অনেক নিম্নবর্ণের মানুষরা উপবীত গ্রহণ করে কুল মর্যাদা লাভ করতে চাইছিল। যেমন ১৮৭২ সালে আন্দুল মৌড়ী গ্রামে কয়েকজন কৈবর্ত যোগীদের (তাঁতের ব্যবসা স্ববৃত্তি) বাড়িতে অন্নগ্রহণ করায় জাতিচ্যুত হন। ফলে যোগীদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়, তাঁরা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত সমাজের কাছে জানতে চান, 'যোগী জাতি পবিত্র কি অপবিত্র এবং তাহাদের ব্যবহার কিরূপ ?' পণ্ডিত সমাজ যোগী জাতিকে 'সদ্ব্যবহার' যুক্ত বলে বর্ণনা করেন। এই বিধান পাওয়ার ফলে কেউ কেউ উপবীত ধারণ করতে আরম্ভ করেন। এই উপবীত গ্রহণের আন্দোলন খুব একটা বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি।

সামাজিক ভাবে অব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রায় সব বর্ণকেই 'সৎ' ও 'অসৎ' শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত করে পশ্চাতে ফেলে রাখার একটা হীন চেষ্টা 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' ও 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ সহায়তায় করা হয়েছে। এইভাবে জাতপাতে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করে সামাজিক জীবনে স্পৃশ্য, অস্পৃশ্যতার খেলা শুরু করা হয়।

'সৎ' শূদ্র

১। করণ। (কায়স্থ)

২। অম্বষ্ঠ (দ্বিজ পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান)

৩। বৈদ্য (জনৈকা ব্রাহ্মণীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে জাত সন্তান, বৃত্তি চিকিৎসা)

৪। গোপ

৫। নাপিত

৬। ভিল্ল (এরা আদিবাসী কোম, কিভাবে সৎ শূদ্রের পর্যায় পরিগণিত হলেন বলা কঠিন)

৭। মোদক

৮। কুবর (?)

৯। তাম্বুলী (তামুলী)

১০। স্বর্ণকার ও অন্যান্য বণিক (এঁরা ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' হয়ে 'অসৎ শূদ্র' পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলেন। স্বর্ণকারদের অপরাধ ছিল সোনা চুরি।)

১১। মালাকার

১২। কর্মকার

১৩। শংখকার

১৪। কুবিন্দক (তন্তুবায়)

১৫। কুম্ভকার

১৬। কংসকার

১৭। সূত্রধর

১৮। চিত্রকার (পটুয়া)

সূত্রধর চিত্রকাররা কর্তব্য পালনে অবহেলা করে ব্রাহ্মণের অভিশাপে 'পতিত' হয়ে অসৎ শূদ্র পর্যায়ে গণ্য হন।

'অসৎ' শূদ্র

'পতিত' বা 'অসৎ' শূদ্রের তালিকায় আছেনঃ

স্বর্ণকার (সুবর্ণ) বণিক। সূত্রধার (বৃহদ্ধর্মপুরাণের 'তক্ষণ') চিত্রকার। (১) অট্টালিকার (২) কোটক (ঘরবাড়ি তৈরি করা যাঁদের বৃত্তি) (৩) তীবর (৪) তৈলকার (৫) লেট (৬) মল্ল (৭) চর্মকার (৮) শুড়ি (৯) পৌণ্ডুক (পোদ) (১০) মাংসচ্ছেদ (কসাই) (১১) রাজপুত্র (পরবর্তী কালে রাউত ?) (১২) কৈবর্ত (কলিকালের ধীবর) (১৩) রজক (১৪) কৌয়ালী (১৫) গঙ্গাপুত্র (লেট-তীবরের বর্ণ সঙ্কর সন্তান) (১৬) যুঙ্গি (যুগী ?) (১৭) আগরী (বৃহদ্ধর্মপুরাণের উগ্র ? বর্তমানে আগুরী)।

'অসৎ' শূদ্রের নিম্ন পর্যায়ের মধ্যে যাঁদের অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে তাঁরা হলেন—ব্যাধ, ভড়, কাপালী, কোল (আদিবাসী কোম), কোঞ্চ (কোচ আদিবাসী কোম), হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগদী), শরাক (প্রাচীন শ্রাবকদের অবশেষ ?), চণ্ডাল প্রভৃতি। কৈবর্তদের সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ব্যাখ্যা দিচ্ছে : ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্য মাতার সন্তান কিন্তু কলিযুগে তীবরদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে এঁরা

ধীবর নামে পরিচিত এবং ধীবর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। ভবদেব ভট্টের মতে ধীবর অন্ত্যজ পর্যায়ের।

ভবদেব ভট্টের অন্ত্যজ পর্যায়ের সঙ্গে বাংলার দুই পুরাণের তালিকা তুলনা করলে কয়েকটি পার্থক্য ধরা পড়ে। ভবদেব ভট্টের বিধান মতে, চর্মকার, সুবর্ণকার, শৌণ্ডিক, রজক, কৈবর্ত প্রভৃতি নিম্নবর্ণের এবং 'পতিত' ব্রাহ্মণদের (অগ্রদানী, ভাট, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি) স্পৃষ্ট খাদ্য ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য। যদি তাঁদের খাদ্যগ্রহণ করে তাহলে ব্রাহ্মণকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

করণ-কায়স্থ

করণ কায়স্থদের সম্পর্কে আলোচনার আগে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আলোকপাত করা উচিত। তা হল অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের কিছু কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও কায়স্থরা শূদ্র কেন? এই প্রশ্নের একটি উত্তর পাওয়া যায়—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal গ্রন্থে। এইগ্রন্থ মতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে সমস্ত অব্রাহ্মণই শূদ্র হিসাবে অভিহিত হওয়ার অন্যতম কারণ, বাংলায় বৌদ্ধ সহজযানী ও তান্ত্রিক কুলাচারের প্রাদুর্ভাবের ফলে লোকায়ত জীবন থেকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কায়স্থরা যে রাজকর্মচারী তা প্রাচীন বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিদ্বারা সমর্থিত। বিষ্ণু স্মৃতি মতে তাঁরা রাজকীয় দলিলপত্রাদির লেখক ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির টিকাকার বলেন—কায়স্থরা ছিলেন লেখক ও হিসাবরক্ষক। এখনও বিহার অঞ্চলে হিসাব রাখার লিখন পদ্ধতির বিশেষ ধরনকে বলে, কাইথী লিপি। করণ শব্দ লেখক ও হিসাবরক্ষক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে কিন্তু করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলা হয়েছে। উত্তর বিহারে করণ সম্প্রদায় এখনও কায়স্থদের একটি শাখা। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থরা আজও অনেকে নিজেদের করণ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুরের করণরা চিত্রগুপ্তকেই তাঁদের আদি-পুরুষ বলে মনে করেন। বাংলা-দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কায়স্থরা একইভাবে নিজেদের পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে জানা যায় খ্রীস্টীয় নবম-দশম শতক থেকে করণরা কায়স্থদের সঙ্গে সমার্থকভাবে বিবেচিত হন। প্রথম কায়স্থ শাম্বপাল, স্কন্দপাল, বিপ্রপাল, করণ কায়স্থ নরদত্ত, কায়স্থ প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, দেবদত্ত, কৃষ্ণদাস, জ্যেষ্ঠকায়স্থ নলসেন প্রমুখ।

বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তথাকথিত 'ভদ্র' জাতের মধ্যে (বৃহদ্ধর্মপুরাণের, উত্তম-সঙ্কর ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের সৎ শূদ্র জাতের মধ্যে) চন্দ্র, গুপ্ত, নাগ দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল, ধর, কর, দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, দেব, পালিত প্রভৃতি পদবীর ব্যবহার এই সময় থেকে আরম্ভ হয়। হিন্দু আমলের শেষ দিক পর্যন্ত চলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থের গৌড়বঙ্গীয় কবিদের নামের মধ্যে। নবম-দশম শতক নাগাদ বাংলায় করণ-কায়স্থরা বর্ণ হিসাবে গড়ে ওঠার লিপি প্রমাণ বিদ্যমান। তবে আধুনিক কালের কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলায় কায়স্থরা নাগর ব্রাহ্মণের বংশধর এবং এইসব নাগর ব্রাহ্মণ পাঞ্জাবের নগরকোট, গুজরাট, কাথিয়াবাড়ের আনন্দপুর (অন্য নাম নগর) প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসেছিলেন।

বৈদ্য-অম্বষ্ঠ

ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্য মাতার সহবাসে উৎপন্ন অম্বষ্ঠ সঙ্কর বর্ণের উল্লেখ একাধিক স্মৃতি ও ধর্মসূত্রে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ সমার্থক কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে দুই পৃথক উপবর্ণ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই পুরাণ মতে বৈদ্যদের উদ্ভব সূর্যতনয় অশ্বিনীকুমার এবং জনৈকা ব্রাহ্মণীর আকস্মিক সঙ্গমে। বৈদ্য ও অম্বষ্ঠরা যে এক ও অভিন্ন এই দাবি সপ্তদশ শতকে ভরত মল্লিকের আগে কেউ করেননি। ইনি প্রথম নিজে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। যদিও এই দুই বর্ণ একই বৃত্তি অনুসারী। এক ও অভিন্ন চিকিৎসাবৃত্তি এই দুই উপবর্ণকে এক ও অভিন্ন উপবর্ণে বিবর্তিত করেছিল। যেমন বাংলার করণ ও কায়স্থদের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

নমঃশূদ্র

উচ্চবর্ণের হিন্দু কৃষিজীবী জাতিকে চিরদিন একটা হীন, উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছে। কঠোর বর্ণ শাসনের সময় থেকেই এই কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদের কোন ভাবেই মানবিক অধিকার পর্যন্ত স্বীকার করা হয়নি! পরবর্তী কালে বৃটিশ শাসনে এই উপেক্ষিত জাতিদের মধ্যে থেকে এক ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন নমঃশূদ্র পূর্ববাংলার নদীমাতৃক দেশের এক বলিষ্ঠ পরিশ্রমী জাতি, যাঁরা কৃষি ও নৌকা চালনায় সমান দক্ষ কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের

কাছে জল অচল ব্রাত্য। পূর্ববাংলা অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায় একসময় বর্ণহিন্দুর অপমান ও উপেক্ষার প্রতিক্রিয়ায় লিখিত ভাবে ঘোষণা করেন, 'আমরা ব্রাহ্মণের জাতি, হিংসা হেতু হউক বা ক্রোধবশত হউক, আমাদিগকে অনেকে না ভালবসিতে পারেন, কিন্তু যুগান্তর ধরিয়া আমাদের ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার দেখিয়া সকলেই একেবাক্যে স্বীকার করেন যে নমঃশূদ্র জাতি প্রাচীন মুনিঋষির অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্তান। দ্বিতীয় কারণ এই যে আমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় আর্য কৃষিকাজ, সেই প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের মহা গৌরবের ব্যবসায়।' (শ্রীরাইচরণ বিশ্বাস নামে জনৈক নমঃশূদ্র সুহৃদ্) জানা যায় নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে পূর্বে বিধবা বিবাহের চল ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের দাবির সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহ বিরোধী আন্দোলন দেখা দিল নমঃশূদ্র সমাজে। শুরু হল জাতপাতের বিরুদ্ধে মানসিক লড়াই।

বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম

এক বিচিত্র মানসিকতার শিকার প্রায় সব নিম্নবর্ণের মানুষ। দীর্ঘদিনের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দাপটে হীনমন্যতা থেকে মনে মনে কাঙ্ক্ষিত ছিল তাদের ব্রাহ্মণত্বের অধিকার। কিন্তু তা কখনই সম্ভব হয়নি। পরিণামে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম হয় হিন্দু সমাজে, যার জোরে ইংরাজ শাসন দীর্ঘদিন কায়েম থাকতে পেরেছে এদেশে। হিন্দু সমাজের প্রতি বিরূপ হওয়ার ফলে এবং ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত শিক্ষাদানের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নমঃশূদ্র জাতি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অন্দোলনে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। নগরবাসী মজুমদার ও রঘুনাথ সরকার নামে বিক্রমপুর নিবাসী দুই ভদ্রলোক পূর্ববঙ্গ ও আসামের তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুরকে জানান যে নমঃশূদ্রগণ বৃটিশের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করেন এবং সরকারের পক্ষেও তাঁদের জন্য শিক্ষা ও চাকুরির দাবিগুলো স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এক সাহসী পরিশ্রমী জাতি অনুদার হিন্দু সমাজের জন্য সেদিন এভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

বাংলার ম্লেচ্ছ ও ভিন প্রদেশী অন্ত্যজ

কথায় কথায় আজও আমরা গোঁড়া হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুরে শুনতে পাব—'ম্লেচ্ছ হয়েছিস তোরা সব, বাপ পিতামহের ধর্মোটাও মানবি না।' কিংবা 'ম্লেচ্ছর ছোঁয়া খেয়েছিস, হেঁসেলে ঢুকবি না'।…প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী সতীসাধ্বী। পতিসেবায় কোন ক্রুটি দেখাতেন না। কিন্তু দ্বারকানাথকে স্পর্শ করার জন্য গভীর রাতেও সাত ঘড়া গঙ্গা জলে স্নান করতেন, কারণ দ্বারকানাথ তাঁর বেলগাছিয়ার বাগান বাড়িতে ম্লেচ্ছদের সঙ্গে পানাহার করেন। দিগম্বরী দেবী ম্লেচ্ছ সংসর্গ দোষের স্পর্শে নিজেকে অশুচি জ্ঞান করার জন্যই এই রাত দুপুরে স্নান করতেন। অবশ্য বিদেশি ইংরেজকে আমরা যেমন এক সময় ম্লেচ্ছজ্ঞানে অন্তঃপুরের জীবন থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতাম ঠিক তেমন বৈষয়িক ও আর্থিক কারণে বৈঠকখানায় সেই 'ম্লেচ্ছ'-কে আদর আপ্যায়নে হুঁকো-বরদার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে ইংরেজদের সঙ্গে দ্বারকানাথের ওঠাবসা থাকলেও তিনি বোধ হয় প্রথম ভারতীয় যাঁর ছিল অসম্ভব স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ প্রেম। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথকে বাদ দিলে, অধিকাংশ বাঙালি ছিল ভাগ্যান্বেষী, মুৎচ্ছুদী ও দাস মনোভাবের মানুষ। অন্তঃপুরে যে ছিল ম্লেচ্ছ, বাইরের জীবনে সেই ছিল প্রভু, পরিত্রাতা। ম্লেচ্ছ ভাষাও ছিল রাজভাষা। থিংক ইংলিশ, রাইট ইংলিশ ও ড্রিম ইংলিশ, এই ছিল নব্যবঙ্গে নব্যযুগের বাবুসমাজের দিবারাত্রের ধ্যান ধারণা।

শ্রেণী স্বার্থে ভাঙা গড়া

আমাদের সমাজে চিরদিন উচ্চবিত্ত ও আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে নিয়মকানুনগুলো শিথিল ও কঠিন করেছেন। সেকালে যা ছিল বর্ণ ও গোষ্ঠী স্বার্থ এখন তা আর্থ-সামাজিক শ্রেণী স্বার্থ। ইংরাজ আগমনের আগেও যারা ছিল ম্লেচ্ছ, তারা ছিল দরিদ্র ভূমিহীন যাযাবর—নেই ঠিকানার মানুষ। হয় তো সেইসব নেই ঠিকানার মানুষদের রক্ত ও অর্থ কৌলীন্য ছাড়াও একটা নিজস্ব সামাজিক গড়ন ও সংস্কৃতি ছিল। প্রভু ইংরেজ এসে উচ্চ ও নীচ

দুই সমাজের যে ক্ষতি করেছে সে সম্পর্কে কার্ল মার্কস-এর মন্তব্য : 'আরব, তুর্ক, তাতার ও মোগল যাঁরা পর পর ভারত দখল করেন তাঁরা শীঘ্রই হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে যান। বর্বর বিজয়ীরা ইতিহাসের শাশ্বত নিয়মে বিজিতদের উচ্চতর সভ্যতার দ্বারা বিজিত হলেন। বৃটিশরাই প্রথম বিজয়ী যাদের সভ্যতা ছিল উচ্চতর—কাজেই হিন্দু সভ্যতা তাদের নিকট অগম্য ছিল। তাঁরা দেশীয় সম্প্রদায়কে ভেঙ্গে, দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ করে এই সমাজে যা কিছু মহান ও উন্নত ছিল তা সমভূম করে এই সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিলেন। তাঁদের ভারত শাসনের ইতিহাসের পাতাগুলি শুধু এই ভাঙার বিবরণ। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পুনরুজ্জীবনের কাজের প্রকাশ দেখা যায় না।' (কার্ল মার্কস / ভারতে বৃটিশ শাসন) ইংরাজ আসার আগে ও পরের ইতিহাসের যেমন পার্থক্য তেমন পার্থক্য এদেশে শ্রেণী ও বর্ণ বিন্যাসেও। ইংরাজের আমলে রাজশক্তি হল একাধারে ম্লেচ্ছ ও ভারতভাগ্যবিধাতা। কিন্তু প্রাক্ ইংরাজ আমলে ম্লেচ্ছ কারা? তাঁরা কি শ্রমদাস সমাজ-সেবক!

নেই ঠিকানার মানুষ

বৈদিক যুগে আর্যরা ভারতের আদি অধিবাসীদের অচ্ছুৎ ও অপাংক্তেয় করে রেখেছিলেন। এমন এক সংস্কার তাঁদের মধ্যে ছিল যা হল : স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট পুরুষকে দেখলে মৃত্যু সন্নিকট হয়। (শঙ্করাচার্য, বেদান্ত ভাষ্য) অনার্যদের সম্বন্ধে আর্যদের এই ধরনের ঘৃণা ও ভীতি কমপ্লেক্স থেকেই বোধহয় একসময় রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষায় আর্যরা তৎপর ছিলেন। অনার্যরা ছিলেন আর্য সমাজে প্রকৃত অর্থে নেই-ঠিকানার মানুষ। সমাজ-শ্রমিক অনার্যদের নানা বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে বিন্যস্ত করার চেষ্টাও আর্যদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মের জন্মগ্রহণ কাহিনী : বলিরাজ ঊর্ধরেতা ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে ওই পঞ্চপুত্রের জন্ম হয়। উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবে এক ধরনের কমপ্লেক্স দেখা দিয়েছিল বাংলায়। জাতিভেদের কঠোর অনুশাসনের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা উচ্চবর্ণের সমাজ জীবন সংরক্ষণ। সেই বেড়ার বাইরে বর্ণ-উপবর্ণে বিভক্ত এই সমাজের কারা ছিল ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ? জল-অচল সমাজ-শ্রমিকরা অধিকাংশই প্রায় ছিলেন ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজ। অস্পৃশ্যরা কি কেউ নয় এই সমাজের?

বর্ণাশ্রমের বাইরেই তাঁদের স্থান ছিল। চণ্ডাল, বরুড (বাউড়ী) ঘট্টজীবী (পাটনী)? ডোলাবাহী (দুলিয়া) মল্ল (মালো) হড্‌ডি (হাড়ি) ডোম, জোলা, বাগতীত (বাগ্দী) এঁরা সকলেই সমাজ সেবক এবং এই হিন্দু সমাজে এঁদের সকলের স্থান সকলের নিচে—অস্পৃশ্য। এছাড়া চতুর্বর্ণের বাইরে উচ্চ বর্ণের যথেচ্ছ যৌন বিহারেও তৈরি হয়েছে নানা অন্ত্যজ বর্ণ।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে ৪১ জাত (প্রচলিত ৩৬ জাত) ছাড়া ম্লেচ্ছ পর্যায়ে আরও কয়েকটি দেশি ও ভিন্‌দেশি আদিবাসী কোমের নাম পাওয়া যায়। স্থানীয় বর্ণ ব্যবস্থায় তাঁদের কোন স্থান ছিল না। যথা—পুক্‌কশ, পুলিন্দ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম শবর প্রভৃতি।

অন্ত্যজ পর্যায়ে আরও একটি বর্ণের খবর পাওয়া যায় বন্দ্যঘটিয় আর্তিহর পুত্র সর্বানন্দ (১১৬০)-র রচনায়। এই অন্ত্যজ হলো বেদে বা বাদিয়া। মূলত সাপ ধরা ও সাপ খেলা দেখানো এদের বৃত্তি। অবশ্য শাস্ত্র বলেছে 'ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাত' কিন্তু কখনই এইসব শ্রেণীকে ভিক্ষাজীবী বলা চলে না। বিষধর সাপকে নিয়ে খেলা দেখিয়ে এঁরা রোজগার করেন। চর্যাগীতি থেকে ডোম, চণ্ডাল, শবর প্রভৃতি নিম্ন অন্ত্যজ বর্ণ ও কোমের নরনারীর বৃত্তির একটা মোটামুটি ধারণা করা চলে—তা হলো বাঁশের তাঁত, চাঙারি বোনা, কাঠ কাটা, নৌকোর মাঝিগিরি, নৌকো ও সাঁকো তৈরি করা, মদ তৈরি করা, জুয়া খেলা, তুলো ধুনা, হাতি পোষা, পশু শিকার, নৃত্যগীতি, যাদুবিদ্যা, ভোজবাজী, সাপ নাচানো প্রভৃতি ছিল এঁদের বৃত্তি। সমাজের অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়ে এই ভূমিহীন মানুষ কখনও শ্রমজীবী আবার কখনও ভিক্ষাজীবী। এঁরা জন্ম-ভিক্ষাজীবী নন, ছিন্নমূল।

কৃষি শ্রমিক হিসাবেও এইসব অন্ত্যজ স্থান পায় না। কিন্তু নিম্ন অন্ত্যজ বর্ণের নরনারীর যৌন জীবনের যে উদার স্বাধীনতা আছে তাকে উপভোগ করেন এক শ্রেণার উচ্চবর্ণের মানুষ। হাতের কাজ করা বা শ্রমজীবীরা স্পষ্টতই আমাদের সমাজে নিম্নতর ও নিম্নতম বর্ণস্তরের মানুষ। বুদ্ধিজীবী ও মসীজীবীরা আস্তে আস্তে সমাজের উপরের বর্ণস্তরে অধিকার বিস্তার করেছেন। তাঁরাই বিচার বিশ্লেষণে অপ্রমাণ করতে চেয়েছেন ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজদের মানবিক অধিকার।

ভবদেব ভট্টের মতে নট, নর্তক, চর্মকার, শুঁড়ি, রজক এঁরা সকলেই নিম্ন জাতের লোক। তাঁর মতে অনেক নিষিদ্ধ বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রবর্ণের অধ্যাপনা, তাঁদের পূজানুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা, চিত্র ও অন্যান্য বিভিন্ন শিল্প বিদ্যার চর্চা প্রভৃতি বৃত্তিও নিষিদ্ধ ছিল। এতে 'পতিত' হতে হত।

ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ' গ্রন্থে সংসর্গ প্রকরণধ্যায় অস্পৃশ্য স্পর্শদোষ সম্বন্ধে নাতিবিস্তর আলোচনা দেখে মনে হয় স্পর্শবিচার সম্বন্ধেও নানাপ্রকার বিধি নিষেধ সমাজে দানা বেঁধে উঠেছিল।

বিবাহ ব্যাপারে বিধিনিষেধ যা ছিল তা খুব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে সুবিধা-ভোগীদের মধ্যে। সমাজের উচ্চবর্ণের পুরুষরা ধন-সম্পদ-দাসদাসীর মত নিম্নবর্ণের নারীকেও ভোগ করতে পারেন অনায়াসে। তাতে কোন বিধি-নিষেধ নেই। পুরুষের ভোগ্যানারী অন্ত্যজ বা নিম্ন বর্ণের নারীরা শ্রমজীবী হওয়ার ফলে তাঁদের শারীরিক সম্পদগুলি অনেক বেশি উপভোগ্য। তাই উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের নারীর বিবাহে নিষেধ ছিল না। ব্রাহ্মণ বর শূদ্র কন্যার বিবাহ সমাজে জল অচল ছিল না ঃ কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের সঙ্গমজাত ফল কি খুব সম্মানজনক স্থান ছিল।—মোটেই না। ভবদেব ও জীমূতবাহনের সাক্ষ্য থেকে উচ্চবর্ণের বর ও নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহের স্বাকৃতি পাই। ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকারের নানা বিধিনিষেধ সম্পর্কে রীতি নিয়মের উল্লেখ করেছেন জীমূতবাহন। এতদসত্ত্বেও বর্ণাশ্রম বহির্ভূত যেসব জাত ছিল তাঁদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধের কোন প্রশ্ন ওঠে না। অর্থাৎ ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজদের সঙ্গে এমনকী শূদ্রের বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল।

সমাজের একপ্রান্তে মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্রাহ্মণ বিচ্ছিন্ন পৃথক, অন্য প্রান্তে স্বাঙ্গীকৃত, স্পর্শচ্যুত অধিকার-লেশহীন অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়। আর মধ্যস্থলে বৃহৎশূদ্র সম্প্রদায়, তাও আবার 'সৎ' ও 'অসৎ' শূদ্রে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও নানা ভৌগোলিক সংজ্ঞায়, 'বারেন্দ্র' 'রাঢ়ী' পাশ্চাত্য' বৈদিক' 'দাক্ষিণাত্য' এবং 'বঙ্গজ' শ্রেণীতে বিভক্ত। অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে দুরতিক্রম্য প্রাচীর। আহার-বিহার-বিবাহ ব্যাপারে নানা বাধা নিষেধ এক বিচিত্রতর সমাজদেহ। তাই আজ বর্ণনিরপেক্ষ স্বাধীন ভারত জাতপাতে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন, হানাহানিমত্ত, আত্মবিধ্বংসী এক সামাজিক অচলায়তন।

ভিন্ন প্রদেশী অন্ত্যজ

আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করা যায় বাংলায় যেমন উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনেক কিছুই গ্রহণ বর্জন করেছে, তেমন চতুর্বর্ণের দুইটি প্রধান বর্ণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাংলায় প্রায় নেই বললেই চলে। বিশেষত নিম্ন বর্ণের মধ্যে উগ্র ক্ষত্রিয় জাতি পরিচয় থাকলেও তারা কখনই চতুর্বর্ণে ক্ষাত্রিয় নয়। বৈশ্য বা শ্রেষ্ঠী শ্রেণীও বাংলায় নেই।

বাংলার কিছু পট্টোলী ও স্মৃতিগ্রন্থে কতকগুলি আদিবাসী অরণ্য ও পার্বত্য কোমের এবং বিদেশি বা ভিন্ প্রদেশী কোমের নাম পাওয়া যায়। যেমন ভিল্ল মেদ, আভার কোল, পৌণ্ড্রক (পোদ) পুক্লিন্দ, পুক্কশ, খস, খর, কম্বোজ, যবন, সুহ্ম, শবর, অন্ধ্র ইত্যাদি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভিল্লদের সৎশূদ্র পর্যায়ে কী করে ফেলা হয়েছে এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের সংশয় আছে। ভবদেব ভট্ট এই সম্প্রদায়কে মেদদের সঙ্গে বিন্যস্ত করেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে। পৌণ্ড্রক (পোদ) অসৎশূদ্র পর্যায়ে পরিগণিত হলেও বাকি সমস্ত কোমই হয় অন্ত্যজ না হয় ম্লেচ্ছ পর্যায়ভুক্ত। কোলেরা পুরাণোক্ত 'কোল্ল' সন্দেহ নেই। পুলিন্দরা যে প্রাচীন কোম তার উল্লেখ নৈহাটি লিপিতেও পাওয়া যায়। পাল আমলের বেতনভুক সৈন্যদের মধ্যে খস্দের উল্লেখ আছে। গৌড-মালব-কুলিক-হূণ কর্ণাট-লাট প্রভৃতির সঙ্গে।

এছাড়াও পুরাণে খস্ পুক্কশ আদিবাসী কোমের উল্লেখ পাওয়া যায়। আভীররা বিদেশাগত প্রাচীন কোম এবং ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে খ্যাত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে এই সম্প্রদায় মধ্যম সঙ্কর পর্যায়ভুক্ত। পণ্ডিতদের মতে আর কোন বিদেশী কোমের পক্ষে এতটা সৌভাগ্যলাভ ঘটেনি। কম্বোজরা উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সুপরিচিত কোম। এরা আসাম-ব্রহ্মদেশ সীমান্তের ভোট অঞ্চলের পার্বত্য কোম হতে পারে কিনা এ সম্পর্কেও পণ্ডিতরা সংশয়ে দ্বিধাবিভক্ত। এক সময় কম্বোজ রাজবংশ বাংলায় কিছুদিন রাজত্ব করেছিল এবং আমরা যাঁদের কোচ বলি তাঁরাই কি এঁদের বংশধর? সুহ্মরা বাংলার প্রাচীন আদিবাসী কোমগুলির অন্যতম। শবররাও তাই। শবর নারীর গুঞ্জাবাচির মালার রূপটানের বর্ণনা চর্যাগীতিতে পাওয়া যায়। শবর শবরীর কামকলায় বৈদগ্ধ কাব্যগুণে সমৃদ্ধ।

হিন্দু সমাজে এইসব অন্ত্যজরা যে আস্তে আস্তে নিম্নস্তরে স্থান পেয়েছেন পাল যুগে, তার প্রমাণ সেই আমলের লিপিতে পাওয়া যায়; 'মেদান্ধ্রচণ্ডালপর্যন্তান' পদাংশটিতে। আজ তাঁরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী।

জাতিভেদ কি বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিরোধী ?

হিন্দু পুরাণের দেবরাজ ইন্দ্রের ব্যক্তি চরিত্রটি কথনই কোন ন্যায়নীতির ধার ধারেনি। প্রয়োজনে যে কোন ছলচাতুরার আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতিপক্ষকে যোগভ্রষ্ট করেছেন, সুরললনা ও স্বর্গ বারাঙ্গনাদের লেলিয়ে দিয়ে অনঙ্গবাণে জর্জর করে মহাযোগীর যজ্ঞ ক্ষেত্রেই উর্দ্ধরেতার রেতঃপাত ঘটিয়ে ছেড়েছেন। অনেক মুনি ঋষির মহর্ষি, ব্রহ্মার্ষি লাভের পথে ইন্দ্রই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের সব কাজে ছিলেন পরামর্শদাতা। যখন উবর্শী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, অলম্বুষা প্রভৃতি বারবিলাসিনীরা ইন্দ্রের নির্দেশিত পথে যোগীর যোগভঙ্গে অপারগ হচ্ছেন, তখনও ব্রহ্মার সামনে নতজানু ইন্দ্রকে পথ বাতলাতে পিতামহ কসুর করছেন না। অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য ও ব্রহ্মার্ষি লাভের পথ থেকে বিচ্যুত করা। গোষ্ঠী স্বার্থকে সুদৃঢ় করা।

বিশ্বামিত্র মহাতাপস, মহর্ষি হয়েও নিরন্তর সাধনা করে চলেছেন ব্রহ্মর্ষি হবার জন্য, তাই ইন্দ্র বিচলিত। তাঁকে যোগভ্রষ্ট করতে পাঠানো হল মেনকাকে। তপশ্চর্যায় ছেদ পড়ল, বিশ্বামিত্রের ঔরসে জন্ম হল শকুন্তলার। ভারতীয় রস সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হল শকুন্তলার জন্ম বৃত্তান্তের কাহিনী কাব্যে কিন্তু এক নগ্ন সত্যও উন্মোচিত হল যে, ব্রাহ্মণত্বলাভে স্বর্গীয় গোষ্ঠীস্বার্থ কত ক্রুর হতে পারে। বিশ্বামিত্র অনুশোচনায় আবার যখন যোগাসনে বসেছেন সিদ্ধকাম হবার জন্য তখনও রম্ভাকে পাঠিয়ে যোগভ্রষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। যেনতেন প্রকারে ব্রহ্মর্ষি লাভে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এবার 'রামায়ণে' দেখতে পাব শূদ্রবর্ণের মানুষের তপশ্চর্যায় অযোধ্যা রাজ্যে নাকি ঘোর অমঙ্গল দেখা দেয়। এক ব্রাহ্মণ সন্তানের অকাল-মৃত্যুতে রাজ্যের কুশাসনের অভিযোগ এনে রাজসভায় অনশনে দেহত্যাগ করতে চাইলে পতিত-পাবন রঘুনন্দন ব্রহ্মহত্যার ভয়ে যে নিষ্ঠুর সহিংস আচরণটি করেন তা কথনই কোন অবতার মহাপুরুষের চরিত্র অনুরূপ নয়। এই ঘটনাতে মনে হয় জাতপাতের বিভেদ-বিষ আমাদের প্রাচীন পুরাণ সাহিত্যের মধ্যে থেকেই সংক্রামিত হয়েছে। ঘটনাটি হলো রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের অষ্টাশীতি ও একোনবতিতম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে ;—

'অনন্তর রাজর্ষিনন্দন রাম দক্ষিণ দিকে আগমন করিয়া বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণস্থিত শৈবলগিরির উত্তর পার্শ্বে সুমহৎ সরোবর সন্দর্শন করিলেন। শ্রীমান রঘুনন্দন সেই সরোবর তীরে অধোমুখে লম্বমান তপঃপরায়ণ তাপসকে অবলোকন করিলেন। মহারাজ রাঘব উৎকৃষ্ট তপোনিরত তপস্বীর সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে সুব্রত। আপনি ধন্য! হে তপোবৃদ্ধ! আমি দাশরথি রাম, কৌতুহলবশত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি হে দৃঢ় বিক্রম! আপনি কোন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি যে অন্যের সুদুষ্কর তপস্যা আচরণ করিতেছেন, তাহার অভিলষিত বর কী? স্বর্গলাভ অথবা অন্য কোন বর আপনার প্রার্থনীয়? হে তাপস! আপনি যাহা অবলম্বন করিয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিতে বাসনা করি। আপনি কি ব্রাহ্মণ? অথবা দুর্জয় ক্ষত্রিয়? কিংবা তৃতীয় বর্ণ বৈশ্য? অথবা শূদ্র? আপনার মঙ্গল হইবে, অতএব সত্য বাক্য বলুন।

'অধোমুখস্থিত তপস্বী নরপতি কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া নরপুঙ্গব দাশরথিকে জাতি ও যে কারণে তপস্যায় রত হইয়াছেন, তাহা বলিলেন।

'তাপস অক্লিষ্ট কর্মা রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোমুখ থাকিয়াই এই বলিলেন, হে মহাযশস্বিন্! আমি শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে রাম! উগ্রতপস্যা অবলম্বন পূর্বক দেবলোকজয় বাসনায় সশরীরে দেবতা হইবার প্রার্থনা করি। হে রাম! আমি আপনাকে মিথ্যা বলিতেছি না। হে কাকুৎস্থ। আপনি আপনাকে শম্বুক নামক শূদ্র বলিয়া বিদিত হউন। সেই শম্বুক এই কথা কহিতে কহিতেই রাম কোষ হইতে সুরুচিরপ্রভ বিমল খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ 'সাধু'—'সাধু' বলিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের প্রশংসা করত মহতী পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।'

এই ঘটনার মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজ নির্দেশিত ন্যায়নীতি ও শিষ্টাচার কি দেখতে পাই? যিনি রঘুপতি রাঘব রাজারাম, যিনি ন্যায় ও করুণার শ্যাম দূর্বাদল কোমল মূর্তি তাঁর এই কি নিষ্ঠুরতম আচরণ? এটি কী—প্রাচীনতম বর্বর শ্রেণী সংঘাত নয়? জাতি প্রাধান্য নিরঙ্কুশ করার ঘৃণ্যতম চেষ্টা নয়? অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে কি উচ্ছেদের চেষ্টা নয়? এমনই বহুতর জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনিতে মুখর করে তোলা যায় ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যের অনেক দেবপ্রতিম চরিত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গে অশোক রুদ্রের মন্তব্যটি উল্লেখ

করা যেতে পারে…'আধুনিক ভারতবর্ষে যে একটি ধারণার প্রচলন করানো হয়েছে যে সত্য ও অহিংসা (যাদের বর্বর অনুবাদ করা হয়েছে Truth এবং Non-violence এই দুটি ইংরেজি শব্দ)—এই দুই হল ভারতের সনাতন ধর্ম, তার কোন সমর্থন অন্তত আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সত্যকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে অহিংসাকে তা দেওয়া হয়নি। অহিংসাকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা দয়া ত্যাগ ক্ষমা ও বৈরাগ্য প্রভৃতিকেও দেওয়া হয়েছে। শব্দ ব্যবহারের বিষয়েও এইটি লক্ষণীয় যে 'অহিংসা' কথাটি বর্তমান শতাব্দীতে যেরকম একটি মন্ত্রপূত কবচের স্থান পেয়ে গেছে তার কোন ভিত্তি পৌরাণিক সাহিত্যে নেই। সেখানে অহিংসা শব্দটি যতটা ব্যবহার হয়েছে তার চেয়ে বেশিই হয়তো হয়েছে অন্য অনেক শব্দ ও বাক্য—যেমন অনৃশংস্য, হিংসাবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্তি ইত্যাদি' (ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন/অশোক রুদ্র, পাপ-পুণ্য, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫) আমরা গান্ধীর 'রাম রাজ্যে'র স্বপ্নের ঘোরে যে কথাটি বারবার শুনতে পাই তা কি এই 'অহিংসা'র মন্ত্রপূত কবচের বিশ্বাস নয়! যার কোন শিকড় আমাদের প্রাচীন সমাজ-মৃত্তিকার পুরাণ কাব্যে ছিল না। গান্ধীজির মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও হরিজন নিধন কি সর্ব-ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর জাতপাতের সংক্রামক ব্যাধি নয়?

বাংলাদেশে বহুদিন মহাযানবাদী বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ছিল সেইজন্য জাতিভেদ বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিরোধী। যখনই জাতিভেদ প্রথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে তখনই বাঙালি তার বিরুদ্ধে অন্দোলন করেছে। চৈতন্যের সময় থেকে তার সে চরিত্র লক্ষণ ধরা পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপনয়নে যখন নিম্ন বর্ণের ধনী কামারিণীকে 'ভিক্ষা মা' হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন তখন 'কামারপকুর' গ্রামের সমাজে নিশ্চয় এক আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, কিন্তু পরম নিষ্ঠাবান ধার্মিক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় পরিবারেও কিশোর গদাধরের এই আবদার শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নেওয়া হয়। গদাধরের উপনয়নে ধনী কামারিণী 'ভিক্ষা মা' হলেন। এই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উন্নত সাধক জীবনে আধ্যাত্ম উপলব্ধি থেকেই বলেছেন ;—'আত্মজ্ঞান হলে জাতিভেদ থাকে না।' (কথামৃত / শ্রীম পৃঃ ৮৭৫) বাঙালি চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর এঁরা কেউ ধর্মত্যাগ করে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন করেননি, এই সমাজ হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। বিদ্যাসাগর কার্মাটারে আদিবাসী-ধাঙড় মহল্লায় গিয়ে আর্ত ও রুগ্নের সেবা করেছেন খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নয়, বাঙালি

ব্রাহ্মণ হয়ে ধর্ম ও শাস্ত্রের অনেক আচার-আচরণকে ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলে অভিযোগে সোচ্চার ছিলেন।

গুপ্ত যুগে আমরা দেখতে পাই ভারতে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের চিন্তা ও জীবন দর্শনকে মহাযানীরা লৌকিক ধর্মে রূপ দিতে চাইছেন। বহু বুদ্ধ এসেছেন আরও বহু বুদ্ধ আসবেন কিন্তু ঐতিহাসিক সেই বুদ্ধ একজন। তিনি একমাত্র দেবতা নন,—তাঁর একপাশে আছে অমিতাভ অন্য পাশে অবলোকিতেশ্বর। জীব-জগতের দুঃখে যে অবলোকিতেশ্বরের অশ্রুবিন্দু থেকে জন্ম নিয়েছেন 'তারা'। এইভাবে মহাযানীরা শত শত দেবদেবীর কল্পনা ও পূজা-অর্চনা শুরু করলেন। স্বয়ং ঐতিহাসিক বুদ্ধ ছিলেন সমস্ত প্রকার পূজা-অর্চনার ঘোর বিরোধী। এই মহাযানীরা ছিলেন বাঙালি লৌকিক ধর্মের প্রাণপ্রবাহের অঙ্গ স্বরূপ। তাই বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজের অভ্যন্তরের বাধানিষেধ ছিল কিছুটা আপসধর্মী। বাংলার কোন মন্দির বোধ হয় অব্রাহ্মণের জন্য রুদ্ধ দুয়ার ছিল না। প্রাচীন যুগ থেকেই অনেক লৌকিক দেব-দেবীর পূজায় পৌরোহিত্যের অধিকার অব্রাহ্মণ, এমনকী নীচ বর্ণের ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ চণ্ডালেরও আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের জাত্যাভিমান আজও বিধ্বস্ত বর্ণব্যবস্থার সমাজেও আছে, তার লৌকিক প্রমাণ হল—'ছোট জাতের কাজ করছি বলে ছোট জাত ভেব না, রীতিমত পৈতেধারী বামুন' এ খেদোক্তি হয়তো অনেকেই শুনেছেন বা শুনতে অভ্যস্ত আছেন। যে কোন হাতের কাজ ও কায়িক শ্রমকে চিরদিন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে হেয় জ্ঞান করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য ব্রাহ্মণতন্ত্রের প্রধানতম স্বভাবলক্ষণ। এছাড়াও এই সমাজে চিরদিন এক ধরনের নীতি ও ধর্মানুশাসনের ব্যাপার আছে যা কখনই উচ্চবর্ণের জন্য খুব একটা পালনীয় নয়। তারা ইচ্ছে করলে পালন করতেও পারেন, না করলে তেমন গুরুতর কোন অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু নীচ বর্ণের মানুষ না করলে অপরাধ হবে।

ধর্ম সম্পর্কে নানা রকম পরস্পর বিরোধী শাস্ত্রোক্তির মধ্যে আমরা ধর্মের উৎপত্তি বিষয় জানতে পারি একটি অদ্ভুত কথা, মহাভারতে—'সমুদায় শাস্ত্র অপেক্ষা আচার শ্রেষ্ঠ। আচার হইতে ধর্মের উৎপত্তি হয়।' (অনুশাসন পর্ব অধ্যায় ১৪৯) এই আচার সর্বস্ব ধর্মের থেকে তৈরি হয় নানা বাছ-বিচার, ছোঁয়া ছুঁই, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিধিনিষেধ। ধর্ম লাভের জন্য মানুষ কী না করতে পারে। এই আচার সর্বস্বতা থেকে জন্ম নিয়েছে—হাঁচি, টিকটিকি, বার, তিথি, দিগশুদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে নানা বিধান মেনে চলার প্রবণতা। শম-দম-দয়া-তিতিক্ষা-শ্রদ্ধা প্রভৃতি যে সব সদ্‌গুণ ছিল যথার্থ হিন্দুত্বের গুণ তার স্থান নিল কতকগুলি কুসংস্কার। হিন্দু সমাজের পালনীয় বিধিগুলি প্রায়

অজ্ঞাতই থেকে গেল। কারণ হিসেবে মনে হয় সমাজের অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণরা শিক্ষা-দীক্ষায় ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে পিছিয়ে পড়ছিলেন। শাস্ত্রকার শাস্ত্রব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণরা ক্রমে যজমানী বৃত্তিকে লাভজনক মনে করে আস্তে আস্তে বেদাধ্যায়ন ও মনন থেকে সরে যাচ্ছিলেন। ইংরাজ আমলের আগেই শুরু হয়েছিল এই পশ্চাদ্গমন।

বিশেষত বাংলার নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া), পূর্ববঙ্গে কোটালীপাড়ার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রগুলি আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। শাস্ত্রের বিধান মেনে চলার তেমন কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র টোলগুলিতে সারস্বত সমাগম কমতে থাকে। সংস্কৃত ভাষার অর্থ সামাজিক গুরুত্ব কমতে থাকায় ধ্রুপদী সাহিত্য-সংস্কৃতি-দর্শন চিন্তার স্থানে হাঁচি, টিকটিকি ও পঞ্জিকার বিধান প্রাধান্য পায়। কিন্তু এই অবক্ষয়ের চিত্রটির পাশেই আমরা তুলে ধরতে পারি বাঙালির জ্ঞানরাজ্যের একটি গৌরবদীপ্ত উজ্জ্বল চিত্র। মনোরঞ্জন রায়ের 'দর্শনের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের মতে—'ভারতের পূর্বাঞ্চল ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার জন্মক্ষেত্র। এখানকার লোক চিরদিন যুক্তি ও বুদ্ধিকে হৃদয় ও আবেগের উপর প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর যখন ভারতের জ্ঞানরাজ্যে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে তখন মিথিলা নবদ্বীপ ও অন্ধ্রের নৈয়ায়িকরাই সারা দেশব্যাপী অন্ধ ভক্তিবাদের প্লাবনের মধ্যে বুদ্ধির ক্ষীণ দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। বাঙালিকে আবেগ সর্বস্ব জাতি মনে করা ভুল। এই আবেগ বাঙালির বাহ্যরূপ। আসলে বাঙালি যুক্তিবাদী এবং বুদ্ধির উপাসক। দেশের সেই দুর্দিনে আমরা বাঙালির মধ্যে সেই জন্যই বাসুদেব, রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি যুক্তির উপাসককে জন্মলাভ করতে দেখি। মিথিলার গণেশ ও বর্ধমান চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। নৈয়ামিক অন্নভট্ট সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্ধ্রে জন্মগ্রহণ করেন। গদাধর অন্নভট্টের সমসাময়িক। এই যুগের নৈয়ায়িকরা সাধারণ খুঁটিনাটির বিচার নিয়ে মেতে ছিলেন—জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল না।'...পূর্ব ভারতে বাংলাই বুদ্ধি ও যুক্তির দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিল, তার জন্যে জাতিভেদ ততটা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি।

এছাড়া লোকায়ত জীবনে বাঙালি ব্রাত্যজনের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি। সেখানে উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (যদিও বাংলায় ক্ষত্রিয় নেই) কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য প্রভৃতি বিশেষ কোন কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু লোকায়ত জীবনের জাতপাত সম্পর্কে আজও গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

শাস্ত্রীয় বিধান : দরিদ্র, অজ্ঞ এবং বঞ্চিত নিম্নবর্ণ

এই মুহূর্তে যে তিনটি গল্পের কথা মনে পড়ছে তা হলো, প্রেমচন্দের 'সদ্‌গতি', রবীন্দ্রনাথের 'অনধিকার প্রবেশ' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সঙ্গম', যার মধ্যে আমাদের এই মহান দেশের জাতপাতের এক সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে। এই তিনটি গল্প আশা করি অনেক বাঙালি পাঠকেরই পড়া আছে, তাই এর মধ্যে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করে নিতে পারবেন তাঁরা। আমরা অনেক সময় এই সংস্কারমুখীন বাঙালি সমাজে থেকে আজও ভারতীয় সমাজের জাতপাতের ভয়াবহ চিত্রটি কল্পনাও করতে পারব না। সারা ভারত জুড়ে এই ঘৃণার আবহ ও মানুষে মানুষে ভেদ-বিভেদের বিষ বাষ্প সৃষ্টি কি একদিনে ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার মত ঘটে গেছে, কিংবা বিদেশি শক্তির প্ররোচনায় আজ যেমন রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম হয়েছে তেমন ঘটনা? না মোটেই তা নয়, ভারতীয় সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম হয়েছে ভারতীয় সামাজিক শাস্ত্রীয় বিধানের মধ্যে দিয়ে। শাস্ত্রই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে, অনেক ক্ষেত্রে রক্তের মধ্যে জাগিয়েছে ঘৃণার মারাত্মক জীবাণু। এই সংক্রামক জীবাণুগুলি আজ ভারতীয় সমাজে যে কোন প্রাণঘাতী ব্যাধির মত আতঙ্কের, তাই লড়াই তার জন্য মানুষের সপক্ষে অমানবিকতার বিরুদ্ধে।

এই ভারতেই নাকি তেমন সমাজ ছিল যেখানে মানুষে মানুষে ভেদ ছিল না। সকলের জন্যই সমান বিধান ছিল। জীবনধারণের জন্য অন্নের অধিকার এই ভারতীয় সমাজেই সমানভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ভাগবতে আছে; অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ। (৭, ১, ১০) অর্থাৎ সর্বভূতে যথাযোগ্যভাবে অন্নাদির সম্যক বিভাগও ধর্ম। এই ভাগবতেই আছে:—

যাবদ্‌ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্ত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যেহভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥ (৭, ১৪, ৮)

'ক্ষুধার ও প্রয়োজনের অনুরূপ অন্ন পাওয়া দেহী মাত্রেরই অধিকার; তাহার বেশি যে অধিকার করে সে দণ্ডার্হ।' তাই ভাবতে আশ্চর্য লাগে

মানুষের অধিকার সম্পর্কে যে দেশের ধর্মগ্রন্থে এত উদার মতের প্রকাশ ঘটেছে, সেই দেশের শাস্ত্রীয় বিধানগুলি মানুষ সম্পর্কে এত অমানবিক কেন?—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে যখন দুলে বউ দুটি ভাত খাবার স্বপ্ন নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে তখনও অনঙ্গ বউ সজল চোখেও তাকে ছুঁতে পারছে না। দু-দলা ভাত পাতায় মুড়ে তার মুখের কাছে রেখে আসছে। 'দুলে বউ' মরার সময় শ্লোক আওড়াচ্ছে 'শালিক পাখি শালিক পাখি ধানের জাউলায় বাস'। প্রায় জাতপাত মুক্ত বাংলাদেশেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের লেখা গ্রাম বাংলার সমাজ সম্পর্কে বিভূতিভূষণের এই উপন্যাস, সামাজিক দলিল। দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয়েও জাতপাতের সংস্কার ভুলতে পারেনি মানুষ।

এবার আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়টির কেন্দ্রবিন্দুতে আলোকপাত করবার চেষ্টা করবো, যেখানে শাস্ত্রীয় বিধান মানুষের অধিকার হরণ করেছে—মানুষকে করেছে পতিত, নীচ।

ভারতীয় সমাজে বর্ণভেদের সূচনা

বেদে আমরা উচ্চনীচ ভেদ দেখতে পাই না দেখতে পাই অস্পৃশ্যতার ভেদ-বিভেদ। 'পণি' নামে পরিচিত একশ্রেণীর মানুষ অনার্য বলে উল্লেখ আছে। এরা গবাদি পশু ও ধনদৌলত চুরি করে আর্যদের উৎপীড়ন করত তাই এদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা আছে (ঋগ্বেদ ৬, ৫১, ১৪, ৬১)। পণ্ডিতরা মনে করেন, বোধ হয় গীতাতেই সর্বপ্রথম বলা হয়েছে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণভেদের কথা।

অথর্ববেদেও বৃত্তিগুলির উচ্চনীচ ভেদ নেই। দাস শব্দে এক শ্রেণীর শক্তিশালী অনার্যদের বোঝাত এবং ইন্দ্রের দাসদের গুহায় ঠেলে দেওয়ার কথা আছে। এতে মনে হয় এইভাবে দাসদের পরাজিত করে নীচ স্তরে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর্যরা দাসকে সম্ভবত চাকর রাখত। বাড়িতে একশ' দাসের জন্য প্রার্থনা আছে বেদে।

মনুসংহিতায় ক্রীতদাস প্রথার উল্লেখ আছে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের দাস হত। সাত প্রকার দাসের নাম পাওয়া যায়।

ধ্বজাহৃত—যুদ্ধে পরাজিত পক্ষ থেকে প্রাপ্ত।

ভক্তদাস—অন্নের জন্যে স্বেচ্ছায় দাসত্ব যে বরণ করে।

গৃহজ—দাসী গর্ভজাত।

ক্রীত—টাকা দিয়ে কেনা।

দত্রিম—কারুর দেওয়া।

পৈতৃক—পুরুষানুক্রমিক।

দণ্ডদাস—বিচারে ধার্য জরিমানা দিতে অক্ষম যে।

ব্রাহ্মণ যুগে শূদ্রকে স্পষ্টই দাস বলা হয়েছে। যারা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার করত না তাদের দস্যু বলা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' শূদ্র ছিল প্রেষ্য; তাকে ইচ্ছে মত কোন স্থান থেকে উচ্ছেদ করা যেত, এমনকী হত্যাও (৭, ৩৫, ৩)। 'শতপথব্রাহ্মণে' বর্ণগুলির নামের মধ্যে শূদ্র নেই। মনে হয় এই সময় শূদ্র ছিল হেয়। 'তৈত্তেরীয়ে' শূদ্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে অসুর থেকে। যজ্ঞস্থানে শূদ্রের প্রবেশ অধিকার ছিল না। রাজসূয় যজ্ঞে শূদ্র ছাড়া আর সকলে রাজার মাথায় জল ছিটতে পারত। তাই কারুর কোন ঘৃণ্য কাজকে বলা হতো শূদ্রোচিত আচরণ। প্রবর্গ্য নামক যজ্ঞে যজমানের পক্ষে শূদ্র ও কুকুরের দিকে তাকান নিষিদ্ধ ছিল।

শূদ্রের যেমন বেদপাঠে অধিকার ছিল না, তেমন শূদ্রের কোন অনুষ্ঠানে বেদমন্ত্রও নিষিদ্ধ ছিল। কোন প্রকার বৈদিক সংস্কার শূদ্রের ছিল না। ব্রাহ্মণকে আঘাত করলে শূদ্রের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ কেটে ফেলা হত; কিন্তু শূদ্রকে ব্রাহ্মণ আঘাত করলে কোন শাস্তির বিধান ছিল না (গৌতম ধর্ম ১২, ১, ১০)। শূদ্রকে শ্মশানের মত অপবিত্র বলা হয়েছে। (বশিষ্ঠ ধর্ম ১৮, ১১) শূদ্রের যাজক পর্যন্ত এমনভাবে নিষিদ্ধকরা হয়েছে যে কোন শূদ্রযাজককে তার পুত্র পর্যন্ত ঘৃণায় ত্যাগ করতে পারত।

বিধি বিধানের ফিরিস্তি দেখলে অনেকেরই হয়তো ক্লান্তি উৎপাদন হবে, তবু এইগুলি পাশ কাটিয়ে শুধু ভাষ্য দেওয়াও সম্ভব নয়। ভারতীয় সমাজ জীবনের দ্বান্দ্বিকতা বুঝতে সব সময় এই সমাজের শাস্ত্রীয় বিধান ও পৌরাণিক কিছু কিছু পরস্পরবিরোধী ঘটনার মর্মচ্ছেদ খুবই সহায়ক। একদিকে যেমন দেখা যাচ্ছে শূদ্রের প্রতি তীব্র ঘৃণা সংক্রামিত করা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে আবার অন্য দিকে তার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখানো হচ্ছে। যেমন ঐলুষ কবষের আখ্যানে দেখা যায় তিনি ছিলেন দাসীগর্ভজাত জারজসন্তান এবং সমাজে ঘৃণ্য। কিন্তু সাধনায় তিনি উচ্চশ্রেণীর শ্রদ্ধেয় ঋষি হয়েছিলেন। 'ঋগ্বেদে'র ১০, ৩০ সূক্তটি নাকি তাঁর মনে উদিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। মহীদাসও ছিলেন শূদ্র। কিন্তু জ্ঞানের সাধনা করে তিনিও

'ঐতরেয়ব্রাহ্মণ' লিখেছিলেন, এবং বৈদিক সূক্তে তিনিও এক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। এইসব কাহিনী থেকে আর একটি তথ্য পাওয়া যায় সত্যিকার জ্ঞান তাপস মনন ও মেধায় ব্রহ্মমেধাবান ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে পারতেন, তার জন্য বিশেষ কোন কুলে জন্মগ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। বুদ্ধি ও জ্ঞানের কোন বর্ণগত উত্তরাধিকার অন্তত বৈদিক যুগের ছিল না। নিষাদ শূদ্রবর্ণের একটি উপবর্ণ ছিল বলে, মনে হয়। 'কল্পসূত্র' মতে শূদ্র বলতে শুধু শূদ্র বর্ণকে বোঝাতো না বিভিন্ন মিশ্রবর্ণকেও বোঝাত। ধর্মসূত্রে আছে যে শূদ্রের সঙ্গে উচ্চবর্ণের বিবাহের ফলে মিশ্রবর্ণের উদ্ভব হত।

স্মৃতিশাস্ত্রে শূদ্র

মনু বিধান দিয়েছেন যে, শূদ্র বহু অর্থ জমাতে পারবে না, কারণ ধনের উন্মত্ততায় তারা ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করতে পারে। উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পথে চলাফেরা করেন সেই পথে শূদ্র শববহন পর্যন্ত করতে পারবে না। শূদ্ররাজ্যে ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ ছিল। 'ব্যাসস্মৃতি' মতে (১, ১৭) শূদ্রের দশ সংস্কার ছিল, কিন্তু তা অমন্ত্রক। 'বীরমিত্রোদয়' 'নির্ণয় সিন্ধু' প্রভৃতি নিবন্ধের মতে কতক সংস্কারের বিনা মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার আছে। 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' প্রভৃতিতে বিয়ে ছাড়া আর কোন সংস্কারে শূদ্রের অধিকার নেই। শূলপাণি, রঘুনন্দন, কমলাকর ভট্টের মতে শূদ্রের সকল ধর্মানুষ্ঠানে শুধু পৌরাণিক মন্ত্র ব্রাহ্মণরা পাঠ করবেন শূদ্র কেবল নমঃ বলে যাবে। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে শূদ্রের যৌন সম্বন্ধের অপরাধে শূদ্রের ছিল মৃত্যুদণ্ড, কিন্তু শূদ্রের স্ত্রীর সঙ্গে এই একই অপরাধে ব্রাহ্মণের ছিল শুধুমাত্র অর্থদণ্ড।

ব্রাহ্মণকে গালি দিলে শূদ্রের জিভ কেটে নেওয়া হত। কিন্তু শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের সমান আচরণে বিনা দণ্ডে বা সামান্য জরিমানা দিয়ে মুক্তি পেত। অশৌচের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের দশ, কিন্তু শূদ্রের এক মাস। বিচার কার্য পরিদর্শনে রাজা স্বয়ং অক্ষম হলে দুঃশীল ব্রাহ্মণকেও প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাতে পারেন কিন্তু শূদ্র জিতেন্দ্রিয় হলেও তাকে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়ার বিধান নেই। নিজের নিযুক্ত শূদ্রের বাড়ি অন্ন ব্রাহ্মণ খাবেন। রান্না করা ছাড়া অন্য খাদ্য শূদ্র দিলে ব্রাহ্মণ খেতে পারেন, কিন্তু শূদ্রের বাড়িতে নয়, পরাশর এই বিধান দিয়েছেন।

কিছু কিছু ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রকে দেখা পর্যন্ত বারণ। এ বিষয় শূদ্র, চণ্ডাল, কাক ও কুকুরের তুল্য। শূদ্রের পক্ষে আর একটি বৈষম্যমূলক বিধান হল, সে প্রভুর পরিত্যক্ত কাপড়-চোপড়, ছাতা, পাদুকা, তোশক প্রভৃতি ব্যবহার করবে এবং প্রভুর ভুক্তাবশিষ্ট খাবে। 'মনুস্মৃতি'র টীকায় মেধাতিথি বিধান দিয়েছেন,—'শূদ্রের মোক্ষ নাই। যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য শূদ্রকে দেওয়া নিষেধ ছিল। এমনকী ঋণের ক্ষেত্রেও শূদ্রের প্রতি অবিচার লক্ষ্য করা যায়। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে (২,৩,৩৭) শূদ্রের দেয় সুদের হার ছিল বেশি। উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান হল, শূদ্রের ঔরসে তার দাসীগর্ভে জাতপুত্র পিতার ইচ্ছা হলে পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পাবে।

অর্থশাস্ত্রে নীচবর্ণ

উচ্চবর্ণের সেবা ছাড়া কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্যাদি বৃত্তিতে শূদ্র বা নীচবর্ণের অধিকার ছিল। এছাড়া কারু বা কুশীলব অর্থাৎ নট, নর্তকী ও গায়ক প্রভৃতিতে শূদ্রের অধিকার স্বীকৃত হলেও অর্থশাস্ত্র বহু মিশ্রবর্ণের উল্লেখ করেছে। চণ্ডাল ছাড়া অন্য নিম্নবর্ণের মানুষ শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারত। চণ্ডালেরা সমাজের বাইরে শ্মশানে থাকত। তাদের ব্যবহার করা কূপ অন্যের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। অন্ত্যাবসায়ী শব্দে (৩, ১৮, ৭) চণ্ডাল এবং আরও নীচ জাতিকে বোঝানো হত, যারা সমাজের বাইরে থাকত। শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি উপজাতি বনে বাস করত।

কৌটিল্য দাস, কর্মকর শব্দ দুটি প্রয়োগ করেছেন। দাসরা বোধহয় ছিল ক্রীতদাস, এমন ক্রীতদাসীও ছিল। এদের মধ্যে আহিতক বলা হত তাদেরকে যারা অধমর্ণের ধারের টাকা শোধ করতে না পারায় উত্তমর্ণের কাছে গচ্ছিত থাকত।

কৌটিল্যের সমাজে ভিখারি ও ভবঘুরে (প্রচ্ছন্দক) অনেক ছিল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ করমুক্ত হবে কিন্তু অন্যেরা নয়। খেয়াঘাটে ব্রাহ্মণের শুল্ক লাগত না (৩, ২০, ১৪) সর্বজনীন উৎসবে ব্রাহ্মণ চাঁদা না দিয়েও অংশগ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের সে অধিকার ছিল না।

সাহিত্যে বঞ্চিত মানুষ

দারিদ্র্যের কয়েকটি লৌকিক চিত্র কোষকাব্যগুলিতে আছে। বঞ্চিত

মানুষের এই চিত্রগুলি সামাজিক দলিল। দু-একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি।

প্রায়শ দেখা যায়, দরিদ্র শিশুরা, হাতে শরীর আবৃত করে, খাবারের আশায়, লজ্জায় হতবাক হয়ে অপরের বাড়িতে দাঁড়িয়ে অর্ধনিমীলিত নেত্রে ওই বাড়ির লোকের খাওয়া দেখে।

সদুক্তিকর্ণামৃত, ২২২৭

আমার জীর্ণ কুটিরের কাঠ পড়পড়, দেওয়াল ভেঙে পড়ছে, দেওয়ালে লম্বা লম্বা ঘাস গজাচ্ছে এবং সারা বাড়িতে কেঁচো খাবার লোভে ব্যাঙগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঐ, ২২৪৬

একই ঘরে রন্ধন শালা, ধান থেকে তুষ ছাড়াবার স্থান, গোলা, শিশুদের বিশ্রামাগার ও শয্যাগৃহ। দারিদ্র্য নিপীড়িত ব্যক্তি এসবই সয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে একই ঘরে ব্যথায় কষ্ট পেতে দেখে তিনি হতভম্ব হয়েছেন।

সুভাষিতরত্নকোষ, ১৩১০

বঞ্চনার ইতিহাস বোধ হয় একইরকম, শুধু যুগে যুগে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় তার রঙ বদল হয়েছে। কখনও শাস্ত্রীয় বিধান, কখনও বেদ পুরাণের কাহিনীতে অনুন্নত শ্রমজীবীগোষ্ঠীকে হীন চক্রান্তে ছোট করা হয়েছে। যেমন ইন্দ্র একসময় দাসদের যুদ্ধে পরাস্ত করে গুহায় ঠেলে দিয়েছেন, তেমনভাবে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলার প্রবণতা উন্নত সমাজের বরাবরই ছিল।

খাদ্য, পানীয় এবং সহবাস প্রসঙ্গে বিচিত্র বিধান

ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর রিরংসার তাড়নায় মানুষ শেষ পর্যন্ত কী না করতে পারে! পৃথিবীর অনেক অপরাধীর জীবন এই তিন শত্রুর হাতে পড়ে যেভাবে বিড়ম্বিত হয়েছে তার ইতিহাসও কম করুণ নয়। মানুষের জীবনে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভে এই তিন রিপু সত্যি জবরদস্ত প্রতিবন্ধক। কিছুতে পথ ছেড়ে দাঁড়ায় না, মানুষ এগিয়ে গেলেও তার পিছু ধাওয়া করে, হয়তো শেষ পর্যন্ত অনেকে এই তিন রিপুর হাত ফসকে পালাতে পারে, আবার অনেকে ধরা পড়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর রিরংসার বাঘ নোখের থাবায়। তারপর শুরু হয় রিপুদের নির্যাতন, মানুষকে ঠেলে দেয় পশুত্বের দিকে। যে মানুষ সোনার মানুষ হতে পারত সে হয়ে গেল গরলসিন্ধু। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের একটি ট্রাজিক চরিত্রের কথা। উপন্যাসটির নাম 'বারোঘর এক উঠোন', আর চরিত্রটি হল ওই উপন্যাসের কে, গুপ্ত। একটা সোনার মানুষ শেষ পর্যন্ত কী হয়ে গেল! এ যেন আমাদের নিষ্ঠুর সময়ের এক ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাস। সেই মহান তিনি রিপু যার নাম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও রিরংসা। মানুষের জীবনের মহার্ঘ জৈব সম্পদ, যার তৃপ্তিতে মানুষ হয়ে যায় পূর্ণ প্রসন্ন আর যার অভাবে সেই মানুষই হয় অমানুষ।

মনুষ্যত্বের মহতী বিনষ্টিকে রক্ষার জন্যই আছে শাস্ত্র বিধান। শাস্ত্র-বিধানও দুই রকমের, এক প্রবৃত্তিপর মনুস্মৃত্যাদি ও দুই নিবৃত্তিপর বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি। আমাদের দেশে মানুষের জীবনকে এই শাস্ত্র বিধান মেনে চলতে হয় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যে। অবশ্য আমাদের শাস্ত্র ব্যাখ্যাতারা অনেক সময় বিধান দিয়েই খালাস হন। সেটা কতটা পালনযোগ্য বা পালন সম্ভব সেটা তারা বিশেষ ভাবেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—'ক্ষুধার্তকে ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়া পাপ'। অবশ্য এই ধরনের পাপ আমাদের এই সনাতনপন্থী সমাজে আগেও অনেকে করেছেন, আজও অনেকে করে চলেছেন। নিরন্ন দরিদ্র মানুষ তার অবস্থাকে পরিবর্তিত করতে পারে না, পার্থিব উন্নতির পথ রুদ্ধ দেখে পারমার্থিক উদ্বোধনে অনেকে দিশেহারা

হয়। তাই অর্থ ও পরমার্থ দুই-ই বিনষ্ট হয়।

মনুস্মৃত্যাদি গ্রন্থে যে সব সামাজিক ও নৈতিক বিধান আছে তা মানুষকে সংযত জীবন ও ন্যায়পরায়ণ হতে বলে, কিন্তু সব সময় যে নিরপেক্ষভাবে বলে তা নয়। এইসব শাস্ত্রে প্রচ্ছন্নভাবে জাতিভেদকে উসকে দেওয়া হয়েছে। বলা যেতে পারে ভারতের জাতিভেদের সূতিকাগার হল এই প্রবৃত্তিপর স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ ও উপপুরাণগুলি। মানুষে মানুষে বৈষম্য ও তারতম্য জীববিজ্ঞানের সৃষ্টি রহস্য হিসাবে থাকতে পারে, কিন্তু ভেদ-বিভেদের বেড়া দিয়ে সামাজিক অধিকারহরণ ও সঙ্কোচন হল প্রাচীন ভারতের শ্রেণী সংগ্রামের নামান্তর।

যদিও এই অধিকার হরণ ও সঙ্কোচনকে আমাদের কাছে ধর্ম-অনুশাসন হিসাবে চালানোর চেষ্টাও হয়েছে। সমাজে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রকার ভয় ও সংস্কারের এবং তার জন্যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থাও তৈরি আছে। যদি এই সব শাস্ত্র বিধানের সঙ্গে নিবৃত্তিপর বেদান্ত দর্শন ও আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মজ্ঞানের কোন যোগ নেই। তবুও খুব সূক্ষ্মভাবে যোগ একটা দেখানোর চেষ্টা হয়। সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর অস্ত্রের আরেক নাম শাস্ত্র। এই অস্ত্রের দুই মুখে ধার, আসা যাওয়া দুই দিক সমান ভাবে কাটে।

এইবার 'মনুসংহিতা' থেকে খাদ্য সম্পর্কে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি। তারপর কিছু কিছু শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে। কারণ জাতপাতের গোঁড়ামীর মূলে আছে এসব বিচিত্র শাস্ত্রীয় বিধান।

খাদ্য ও পানীয়

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্বং প্রাণস্য ভোজনম্॥ ২৮॥

'পৃথিবীতে যা কিছু পদার্থ আছে, সে সমুদায়ই প্রজাপতি, জীবের অন্নস্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব স্থাবর জঙ্গম উভয়ই জীবের ভোজ্য।'

(মনুসংহিতা, শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ পঞ্চম অধ্যায়। ২৮।)

যদিও প্রাণী হিংসা সম্পর্কে বার বার মনুসংহিতায় নিষেধ ও পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও মাংস ভক্ষণকে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

ন কৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যাস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৪৮॥

'প্রাণিহিংসা না করিলে কখনও মাংস উৎপন্ন হয় না; প্রাণিহিংসা স্বর্গজনক নহে, অতএব অবিহিত মাংস ভোজন করিবে না।'

(মনুসংহিতা, শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ পঞ্চম অধ্যায়। ৪৮।)

তাহলে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে অবিহিত মাংস ভোজনে নিষেধ আছে। কিন্তু বিহিত মাংস ভোজনে দোষ নেই। কিন্তু আরেকটি পরস্পর বিরোধী মন্তব্য এই মনুসংহিতার 'পঞ্চম অধ্যায়'-এ আছে, তা হলো—শাস্ত্র নামক অস্ত্রের দুই মুখ ধার। তাই দোষ আছে, আবার দোষ নাই, এই বৈপরীত্য।

চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিনামপদাদংষ্ট্রিণঃ।

অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ ॥ ২৯ ॥

'অচর তৃণাদি স্থাবর—চরণশীল পশুপক্ষী প্রভৃতি জঙ্গমের ভক্ষ্য, দন্তশীল প্রাণিগণ দন্তহীন প্রাণীদিগকে ভক্ষণ করে, হস্তহীন মৎস্যাদি হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যদিগের ভক্ষ্য এবং ভীরু জীবেরা চিরকালই বীরগণের ভক্ষ্য।' ২৯।

(মনুসংহিতা, শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ পঞ্চম অধ্যায়।)

প্রয়োজনে সবকিছু মেনে নিতে পারে এমন বিধানের নানা প্রকার ফাঁক ফোকরে সুযোগ সন্ধানী শাস্ত্রকারদের শ্রেণী স্বার্থও সংরক্ষিত হয়।

'ঋগ্বেদে' অন্ন শব্দটি বারবার ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র 'ভাত' নয় খাদ্যমাত্রই বোঝানোর জন্যে ওই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এছাড়াও মনুর বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণের আচরণীয় সম্পর্কে মনুপুত্র ভৃগু বলেন, বেদ অভ্যাস না করলে, সদাচার পরিত্যাগ করলে, কর্তব্যকর্মে অলস হলে এবং দূষিত অন্ন ভোজন করলে মৃত্যু ব্রাহ্মণগণের প্রাণহিংসা করে থাকে। অবশ্য মনু খাদ্য সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন তা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যসম্মত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্রায়ই তাঁর বিধান পরস্পরবিরোধী ও বিচিত্রভাবে একদেশদর্শী।

মাংসভক্ষণ সম্বন্ধে প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তির প্রশংসা আছে 'মহাভারতে' (অনু ১১৫)। অবশ্য শান্তিপর্বে কচ্ছপ ছাড়া সব চতুষ্পদই নিষিদ্ধ—এ নিষেধ বোধহয় শুধু ব্রাহ্মণের জন্য। নিষিদ্ধ পাখির মধ্যে আছে, হংস, প্লব, বক, কাক, গৃধ্র, উলুক (শান্তিপর্ব, ৩৭, ১৮)

মাছ খাওয়া সম্পর্কে ব্রাহ্মণের আঁষ ছাড়া মাছ অভক্ষ্য ছিল (শান্তিপর্ব, ৩৬, ২২)। ভক্ষ্য মাংসের মধ্যে পতঞ্জলি উল্লেখ করেছেন 'পঞ্চনখ' বিশিষ্ট জীবের। গ্রাম্য শূকর ও মোরগ নিষিদ্ধ। মাংসৌদন বা মাংস মেশান ভাত

অতিশয় প্রিয় খাদ্য ছিল।

'মনুস্মৃতি'র পঞ্চম অধ্যায় এবং 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র আচারাংশে খাদ্য, পানীয় সম্বন্ধে বিধিনিষেধ আছে। কৃসর (চালসহ সিদ্ধ তিল) সংযাব (ঘি, দুধ, গুড়, গম মিশিয়ে সিদ্ধ) পায়স, অপূপ—এগুলি দেবতাকে না দিয়ে খাওয়া নিষেধ।

যে গরুর বাচ্চা হওয়ার পর দশদিন কাটেনি সেই গরু, ষাঁড়ের সঙ্গে যৌন মিলনে ইচ্ছুক রজস্বলা গাভির ও বিবৎসা গাভির দুধ অপেয়। যে জানোয়ারের খুর জোড়া তার, ভেড়ার এবং মোষ ছাড়া অন্য বুনো জন্তুর দুধ নিষিদ্ধ। মনুও মাংস ভোজন সম্পর্কে প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তির প্রসংশা করেছেন। মাছ খাওয়াকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হয়েছে। ভক্ষ্য মাছের মধ্যে মনু উল্লেখ করেছেন এইগুলির—আঁষযুক্ত, পাঠিন, রোহিত, রাজীব ও সিংহতুণ্ড (সিংমাছ)।

পাণিনি ও পতঞ্জলি

পাণিনির মতে খাদ্যদ্রব্য চার শ্রেণীতে বিভক্ত—

(১) ভোজ্য—সাধারণ খাদ্য।

(২) ভক্ষ্য ও মিশ্রীকরণ—এ শ্রেণীর মধ্যে আছে পলল (মাংস), সূপ, শাক, গুড়, তিল, ঘি।

(৩) ব্যঞ্জন ও উপসিক্ত—খাদ্যে স্বাদের জন্য যা মাখা হয়, দই মাখন প্রভৃতি।

(৪) সংস্কৃত—যেখানে প্রস্তুত হয় সেখানে থেকেই যা খাওয়া যায়, যেমন হাতে ভাঙা শস্য বিশেষ।

রামায়ণ ও মহাভারত

আমরা দেখতে পাই 'রামায়ণের' যুগে আমিষ ও নিরামিষ দুইরকম খাদ্যের প্রচলন ছিল। বানরেরা নিরামিষ খেত আর রাক্ষসেরা আমিষ খেত।

'রামায়ণ' থেকে মনে হয় বানরের মাংস নীচজাতির লোকরা খেত। সমাজের উচ্চশ্রেণীর কাছে ছিল নিষিদ্ধ। পঞ্চনখবিশিষ্ট জীবজন্তুর মধ্যে খরগোস, সজারু, গোসাপ, কচ্ছপ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে খাওয়ার প্রচলন ছিল।

'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে' ভাত অতিশয় জনপ্রিয় খাদ্য ছিল। 'ভাত' উচ্চ নীচ সব বর্ণের মানুষই খেতেন।

'মহাভারতে' দেখতে পাই যে সমাজে মদ্যপানের বেশ চল ছিল। এমনকী মেয়েরাও মদ খেত (বিরাটপর্ব, ১৬, ৩৪, আদিপর্ব ১৪৮, ৮, স্ত্রী পর্ব ২০৭)। এছাড়া অন্যান্য মধুর পানীয় মধ্যে ছিল কৈরাতিক, এটা বোধহয় কিরাতেরা তৈরি করত বা পান করত।

সুরা পান 'গ্রাম্যসুখ' বা ব্যসন বলে নিন্দা করলেও এর অভ্যাস ছিল ব্যাপক। একজায়গায় সুরাকে বলা হয়েছে সর্বশোক বিনাশিনী। স্ত্রী সম্ভোগ ও যুদ্ধ প্রসঙ্গে সুরা পানের রীতি সংশ্লিষ্ট ছিল। পানভূমির উল্লেখ আছে। এখানে নানা রকম ব্যভিচার ও অবৈধ যৌন সম্ভোগ চলত। অসংস্কৃতা পানভূমি বোধ হয় নীচ জাতির লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

'অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাই মদ্যপান ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রীয় পানভূমিতে বিদেশিদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া বেশ কয়েক প্রকার মদের উল্লেখ আছে, যেমন—মদক (চাল থেকে তৈরি) প্রসন্ন (ময়দা থেকে তৈরি), আসব (আখের রস ও কয়েদ বেল দিয়ে তৈরি), মৈরেয়, মধু (আঙুর থেকে করা), অরিষ্ট (ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত) শ্মশান-বন্ধুদের মদ দেওয়ার রীতি ছিল। সাধারণ লোকের মধ্যেও এ প্রথার চল ছিল।

সহবাস সম্ভোগের বিধি নিষেধে জাতিভেদ

স্ত্রীকে কিভাবে দেখেছেন এইসব শাস্ত্রকাররা। যদিও উচ্চতর হিন্দু দর্শনে আত্মার কোন লিঙ্গ ভেদ নেই, নারী-পুরুষ স্বতন্ত্র কোন স্বভাব বিশিষ্ট নন। কিন্তু মনু ও অন্যান্য শাস্ত্রে নরনারীর সম্পর্ক ও বিশেষ যৌন সম্ভোগ বিষয়ে দাম্পত্য জীবনে কী করণীয় তা আলোচনা করা হয়েছে।

'মনুসংহিতা'য় বলছে ;—

'নারী ক্ষেত্রস্বরূপা এবং পুরুষ বীজ স্বরূপ, ক্ষেত্র ও বীজ উভয় সংযোগে যাবতীয় শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন স্থলে বীজের প্রাধান্য, কোথাও ক্ষেত্রের প্রাধান্য ; কিন্তু যে স্থলে ক্ষেত্র ও বীজ উভয়েই সমভাব থাকে, তদুভয় সহযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা অধিক প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত॥' ৩৩-৩৪॥

(মনুসংহিতা, শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ নবম অধ্যায়॥ ৩৩-৩৪॥)

নারীকে ক্ষেত্র হিসাবে ভাবলেও সময় হিসাবে তাকে আবার শয্যায় সহবাসে অন্যভাবেও দেখা হয়েছে। তাই পবিত্র গার্হস্থ্য জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখেই,

আবার অনেক সময় বিবাহ ও সহবাসের ফল স্বরূপ পুত্রের উত্তরাধিকার সম্পর্কে মনু বিধান দিয়েছেন। যেমন—

'সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রদিগের বিভাগ বর্ণিত হইল ; এক্ষণে নানাবর্ণের স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রদিগের বিষয় বলা যাইতেছে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্রমশঃ বিবাহিত চারিজাতীয় স্ত্রীর গর্ভজ সন্তানদিগের প্রাপ্য বিষয় বিভাগ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে॥' ১৪৮-১৪৯ ॥

'ব্রাহ্মণীর গর্ভজ সন্তান একটি কর্ষক, একটি বৃষ, একটি যান, অলঙ্কার এবং একটি বাসভবন ও অপর বিষয়ের এক প্রধান অংশ প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ তিন অংশ, ক্ষত্রিয়া সুত দুই অংশ, বৈশ্যাপুত্র দেড় অংশ এবং শূদ্রাসুত এক অংশ প্রাপ্ত হইবে॥ ১৫০-১৫১ ॥' (মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়)

এই বিধান থেকে একটি কথা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, ব্রাহ্মণ যথেচ্ছাচার ভাবে সহবাসে সব বর্ণের নারীতেই পুত্র উৎপাদন করতে পারতেন, কিন্তু উত্তরাধিকার হিসাবে অব্রাহ্মণ বর্ণের নারীর গর্ভজাত সন্তান সমান অধিকার পাবে না। ব্রাহ্মণ পুরুষ তার কাম চরিতার্থ করতে যেমন যে কোন বর্ণের নারীকে উপপত্নী রাখতে পারতেন, তেমন শূদ্রের সে অধিকার ছিল না। মনুসংহিতার নির্দেশ হল—

শূদ্রস্য তু সবর্ণৈব নান্যা ভার্য্যা বিধীয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতংভবেৎ ॥ ১৫৭ ॥

শূদ্রের সমজাতীয়া ভিন্ন অন্য পত্নী হইতে পারে না, অতএব উহার একশত পুত্র হইলেও সকলেই পৈতৃক ধনে সমভাগী হইবে॥ ১৫৭ ॥

(মনুসংহিতা, শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ, নবম অধ্যায় ॥ ১৫৭ ॥)

মনু দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলেছেন। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম প্রভৃতি। সকলের সমান উত্তরাধিকার ছিল না। অথচ সমস্ত মানব সন্তানের জন্মই তো পিতামাতার যৌন সম্ভোগের ফল। অযোনি সম্ভূত মানব তারা তো মহামানব (Superman)। তাই প্রত্যেক সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব সমান হওয়াই উচিত। নরনারীর মিলনকে মনু ক্ষেত্র ও বীজের উপমায় উপমিত করেছেন। পুত্রের জন্মের উদ্দেশ্যকে যতই ধর্মীয় ব্যাখ্যায় ভূষিত করার চেষ্টা হোক, ব্রাহ্মণের অসংযমী যৌন জীবনের আরেকটি প্রমাণ হল বহু বর্ণা নারীর সঙ্গে উপগত হওয়া, এবং যৌন অপরাধকে শাস্ত্রসম্মত করা। মনু যখন বলেন— 'কুৎসিত ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে গেলে মনুষ্য যেরূপ ফল লাভ করিয়া

থাকে, ক্ষেত্রজ প্রভৃতি কুপুত্রের দ্বারা পরলোকে লোক সেইরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।'

শুধু জিজ্ঞাস্য, এ কার পাপ? নারী ব্যভিচারিণী যাতে না হয় তার জন্য মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে যতরকম বিধি বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু ব্যভিচারী পুরুষ সম্পর্কে কোন নির্দেশ নেই। বরঞ্চ অবৈধ যৌন সম্ভোগের উপজাত সন্তানকে প্রতারণা করা হয়েছে। কোথাও দাম্পত্য প্রেম নেই, আছে শুধু কাম চরিতার্থের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপা নারী। কোন প্রেম, প্রীতি নেই, আছে শুধু কামাচারী পুরুষের জাত্যাভিমান। স্ত্রী হলো পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ। মনু বলছেন—'ব্রাহ্মণ কামবশতঃ স্বপরিণীতা শূদ্রাতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, ঐ পুত্রকে পারশব বলে। পার অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে পারগ হইলেও শব অর্থাৎ মৃতের ন্যায় অনধিকারী, একারণ পারশব॥ ১৭৮॥ (শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গানুবাদ)

হিন্দু সমাজের নৈতিক শিথিলতার একটি দৃষ্টান্ত তা হল দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ। 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'তে এই দ্বাদশ প্রকার পুত্রের স্বীকৃতি আছে—ক্ষেত্রজ (একের স্ত্রীর গর্ভে অন্য ব্যক্তির উৎপাদিত সন্তান), গূঢ়জ (স্বামীর অনুপস্থিতিতে অজ্ঞাত ব্যক্তির উৎপাদিত), সহোঢ়জ (বিয়ের পূর্বে গর্ভবতী নারীর সন্তান) প্রভৃতি। এইভাবে সমাজে বর্ণসঙ্কর শ্রেণী দেখা দেয়। যেহেতু ব্রাহ্মণের একাধিক বর্ণের স্ত্রী শাস্ত্রানুমোদিত, সেহেতু সমাজে বহু বর্ণ সঙ্কর সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। অথচ ঘৃণা ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের বিধানে নিম্নবর্ণের প্রতি বঞ্চনা হয়েছে বেশি।

ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাস

যৌন ব্যভিচারকে ধরে রাখার জন্যই বোধহয় প্রত্যেক সমাজে গণিকাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও প্রাচীনকাল থেকে পতিতা বৃত্তিকে সামাজিক অনুমোদনে জিইয়ে রাখা হয়েছে। কৌটিল্য ব্যবস্থা দিয়েছেন যে পতিতাদের দিয়ে রাজদ্রোহীদের সঙ্ঘপ্রধানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করবে এবং তাদের সবনাশ করবে। এছাড়া ভিক্ষুকী বা পরিব্রাজিকা সেজে স্ত্রীলোক উচ্চ রাজকর্মচারীর অন্তঃপুরে সসম্মানে প্রবেশ করে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করবে। কৌটিল্যের নীতি অনুসারে 'পতিতাবৃত্তি' রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল। তাহলে প্রশ্ন, সেই পতিতাকে সমাজের এক প্রান্তে ঠেলে রেখে বিভেদ ও ঘৃণার পাঁচিল তোলা কার স্বার্থে? এও কি ব্যভিচারী সমাজপতিদের শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা

নয়? স্মৃতিশাস্ত্রে অবশ্য পতিতার প্রতি আসক্তি তীব্রভাবে নিন্দিত হয়েছে। পূর্বে এ শাস্ত্র অনুযায়ী পতিতাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। এই শাস্ত্র মতে নাম লেখান 'পতিতা' ছাড়াও সমাজে অনেক নারী পুরুষকে দূষিত করত, এদেরকে বলা হত পুংশ্চলী।

পাপ-পুণ্য সমান দায়ভাগ সমাজ জীবনের পরতে পরতে লুকানো থাকে। ধর্ম আর পুণ্য নিয়ে যতই সোচ্চার হোন শাস্ত্রকার, পাপ কিন্তু পিছু ছাড়ে না। পিছুটানে, অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

প্রাচীন ভারতে যৌন ব্যভিচার ও বিচিত্র বিবাহ বিধানে জাতপাত

সিগমণ্ড ফ্রয়েডকে যখন খ্রীস্টীয় নীতিবাগীশরা পাপবোধের জাঁতাকলে পিষছিলেন তখন এক পাদরি সাহেব হঠাৎ একটি মন্তব্য করেছিলেন ফ্রয়েডকে সমর্থন করে। সেই পাদরির অবস্থা কী হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তা জানা যায়নি, তবে যে কোন দেশের নীতিবায়ুগ্রস্ত জীবনবিমুখ মানুষের টনক নাড়ানোর পক্ষে সেই পাদরির আপ্তবাণীটি বড় বেশি কার্যকর বলে মনে হয়। পাদরি সাহেব সোজা ঈশ্বরের দিকে আঙুল ছুঁড়ে মানুষের নিষিদ্ধ যৌনজীবন সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,—'We shouldn't be ashamed to speak, what God was not ashamed to create—হক কথার এক কথা। ভগবান যদি সৃষ্টি করতে লজ্জাবোধ না করেন তবে নিষিদ্ধ যৌন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে এত লজ্জা ও এত পাপচিন্তা কেন? অবশ্য খ্রীস্টীয় পাপবোধ সম্পর্কে কোন মন্তব্য না করেই আমরা বলতে পারি ভারতীয় দর্শন ও ধর্মচিন্তায় মানুষের যৌনজীবনকে কখনই কোন পাপবোধে দূষিত করেনি। ভারতীয় ধর্মে এই জীবনকে সুন্দর ও সংযত করার নির্দেশ দেওয়া আছে। রতিক্রিয়াকে 'প্রাণযাগ' বা প্রাণসৃষ্টি যজ্ঞ হিসাবে 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকী যোনিকেশকে যজ্ঞকুশ হিসাবে মনে করা হয়েছে। তাই পুত্রকন্যার জন্ম শুধুমাত্র দেহজাত নয়, তারা আত্মজ ও আত্মজা।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যি কি শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠতম জৈব-প্রবৃত্তিকে এক সুন্দর সংযত রূপ দিতে পেরেছিল? যে দেশের কাব্যে পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরীর যৌন জীবনকে কাব্য-সুষমায় ধরা হয়েছে, যে দেশে কামশাস্ত্র রচিত হয়েছে, সেই দেশে পরবর্তীকালে বর্ণাশ্রম বিভক্ত সমাজে যৌনজীবনকে বিবাহবন্ধনে বাঁধার সময় এত ভেদাভেদ কেন? সেই ভেদ জাতিভেদ, ও জাতপাতের ভেদ।

যে সমাজ ব্যভিচার বন্ধ করতে ব্যভিচারিণীর সম্পর্কে বারবার সতর্কবাণী

দিয়েছে, সেই সমাজের শাস্ত্রকার কিন্তু ব্যভিচারী পুরুষকে তেমনভাবে সংযত করতে পারেননি। আমরা এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবনের যৌন ব্যভিচার সম্পর্কে আলোচনা করে নিলে পরবর্তীকালের বিবাহে উচ্চ ও নীচবর্ণে ভেদাভেদের গোঁড়ামির অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারব।

যৌন ব্যভিচার ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি

আমাদের হিন্দু সমাজের আকরগ্রন্থ বেদ। এই বেদ-বহির্ভূত কোন কিছুই আমরা সহজে মেনে নিতে পারি না। এই বেদের সমর্থন না পেলে আমাদের সমাজজীবন প্রায় এক সময় অচল হত। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য সবই হত বেদের বিধান মেনে। সত্যি এমন সর্বংসহা, সর্বাশ্রয়ী মহাগ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল। কোন কিছুকেই বেদ পরিত্যাগ করেনি। তাই মানুষের কাম প্রবৃত্তি ও তার বিকৃতি সম্পর্কে অনেক কথা 'ঋগ্বেদে' ও 'অথর্ববেদে' জানতে পাই।

'ঋগ্বেদে' অবৈধ যৌন সংযোগ, উপপতি, উপপত্নী, সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায় (৮, ২১, ৫, ১০, ৯, ৩ ইত্যাদি) জারিণীকে জারের পেছনে এবং পুরুষকে নারীর পিছনে ছুটতে দেখা যায়। যম-যমীর সূক্ত ছাড়াও ভাই-বোনের যৌন সম্ভোগ দেখা যায়। জারজ সন্তান নষ্ট করার কথা (২, ২৯, ১, ৭, ৪৬)। অনেক পণ্ডিত মনে করেন 'ঋগ্বেদে'র কিছু কিছু অংশ যৌনজীবনের প্রতীক। জমিতে বৃষ্টিপাতের দৃশ্যকে বৃষকর্তৃক গাভীতে শুক্রসঞ্চারের প্রতীক হিসাবেও বর্ণনা আছে।

'অথর্ববেদ'-এ যৌনজীবনের অনেক তথ্য আছে। সেই বেদের যুগেও ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসভঙ্গের কথা অথর্ববেদে পাওয়া যায়। এছাড়া পুরুষের রতিশক্তিবর্ধক মন্ত্র ও ঔষধের কথা আছে। (কৌশিকসূত্র-৪০, ১৪, থেকে অথর্ব ৪, ৪)। এ বেদেও বেশ্যাবৃত্তির উল্লেখ আছে। (৫, ৭, ১০)।

বৈদিক যুগের পর ব্রাহ্মণ যুগে বিবাহ পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষে অবশ্যকরণীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। নর-নারীর জীবনের পূর্ণতা এই বিবাহের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় (ঐতরেয় ১, ২, ৫ শতপথ ৫২, ১, ১০)। স্ত্রী শুধু একটি ভোগ সামগ্রী নয় তিনি সখা-ও মূর্তিমতী শ্রী। বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য। (ঐতরেয় ৭, ৩৩, ১) কিন্তু ব্যতিক্রমও ছিল আর্যজায়া, শূদ্রা (শতপথ,

১৩,২, ৯, ৮) শব্দ দুটি থেকে বোঝা যায় নীচবর্ণের নারীকে উপপত্নী বা রক্ষিতা হিসাবে রাখা হত। সুদূর অতীত থেকেই বিবাহ বন্ধনকে পবিত্র ও অচ্ছেদ্য কল্পনা করেও নিম্নবর্ণের নারীকে উপপত্নী রাখা হয়েছে। বেশ্যা শব্দটি বৈদিক যুগে পতিতা রমণী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর্যশ্রেণীর সাধারণের ভোগ্যা হিসাবে। (বাংলাভাষার অভিধান/জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস)।

এবার আমরা রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই ভারতীয় মহাকাব্যের যৌন-জীবনের উচ্চ ও নীচবর্ণের ভেদ ব্যবস্থা লক্ষ্য করতে চেষ্টা করবো।

'রামায়ণে'র যুগে 'রাক্ষস' 'পৈশাচ' দুই প্রকার বিবাহের প্রচলন ছিল। 'রাক্ষস' বিবাহে বলপ্রয়োগ করা হত আর 'পৈশাচ' বিবাহে ঘুমের মধ্যে পাত্রীকে সম্ভোগ করে পরে বিবাহ হত। অনুলোম বিবাহই নিয়মসিদ্ধ ছিল। প্রতিলোম বিবাহও হত। পুরুষের বহুবিবাহ স্বীকৃত ছিল, কিন্তু নারীর পক্ষে নিন্দিত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে হত,—যেমন তারা ও রুমা বানর ভ্রাতা বালী ও সুগ্রীবের উভয়ের স্ত্রী ছিলেন।

'মহাভারতে' অবশ্য নারীর বহুপতিত্বের জ্বলন্ত নিদর্শন হলেন 'দ্রৌপদী'। দ্বিজের পক্ষে শূদ্রবিবাহ নিষিদ্ধ হলেও এরকম বিবাহ হত (শান্তিপর্ব, ১৭১, ৫)। এছাড়া ব্রাহ্মণের নিষাদী ও চণ্ডালিনীকে বিবাহের দৃষ্টান্তও আছে (আদিপর্ব ২৯, ৩)। কোন কোন মতে শূদ্রানারীকে সম্ভোগ করতে পারতেন ব্রাহ্মণ কিন্তু সম্ভোগ জাত পুত্রের ধর্মকার্যে আইনগত কোন অধিকার ছিল না।

এছাড়া মহাভারতে নর-নারীর অবৈধ যৌন মিলনের অনেক প্রমাণ আছে। আদিপর্বে দেখা যায় স্ত্রীলোকের ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে যে কোন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারত (১২২, ২৫, ২৬)। পরস্ত্রী সম্ভোগ নিন্দিত হলেও সমাজে এ ব্যভিচার হত। কুমারী মাতৃত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কুন্তী। এছাড়াও অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে পরস্পর আসক্তিবশত মিলিত হওয়ার নিদর্শনও আছে, যেমন পরাশর-সত্যবতী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা। 'প্রণীত' নামে এক ধরনের পুত্র ছিল যার জন্ম হত কোন বিবাহিতার গর্ভে গুণবান ব্যক্তির ঔরসে। এছাড়া 'স্বৈরিণীজ' নাম থেকেই এই পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত বোঝা যায়। 'জ্ঞাতিরেতা' ছিল এমন পুত্র যার জন্ম স্বামীর ভাই ছাড়া অন্য কোন জ্ঞাতির ঔরসে।

গৃহস্থ তার নীচকুলের দাসী গর্ভেও সন্তানের জন্ম দিতেন (বিরাট পর্ব-

১৫, ১৬, সভা ৭১, ৩, আদি ১০৬, ২৪)। বিদুরের জন্ম হয় এমন মিলনের ফলে। আশ্চর্য, এইসব ধরনের যৌন মিলনে ধর্মপত্নীর সহায়তা থাকত। বিত্তবানের রক্ষিতা রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। গান্ধারী যখন গর্ভবতী সেই সময় এক বৈশ্য নারী ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে থাকত। ধৃতরাষ্ট্র ও ওই বৈশ্যনারীর যৌনমিলনের ফলে জন্ম হল যুযুৎসুর। (আদিপর্ব ১১৫, ৪১, ৪৩)।

মহাভারতের এক জায়গায় বলা হয়েছে মাংসখণ্ডের প্রতি বাজপাখির মত বিধবাদের উপর লোকেদের লোলুপ ও লালসাপূর্ণ দৃষ্টি ছিল (আদি ১৫৮, ১২)। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাচীন ভারতে যৌন ব্যভিচারের চিত্র এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আধিপত্য। সমস্ত সময় দেখা যায় নিম্ন বর্ণের নারীরা রক্ষিতার বেশি মর্যাদা লাভ করছে না। কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের উপায়স্বরূপা নারী। সে নারী গৃহের সাধ্বী স্ত্রী আবার কখনও কখনও স্বৈরিণী, দাসী বা বিধবা অনাথা। এইভাবে ভারতীয় সমাজে তৈরি হয়েছে বর্ণ-সঙ্কর এক শ্রেণী, যারা চিরকাল উচ্চবর্ণের উপেক্ষার আর ঘৃণার শিকার হয়েছে। যৌনজীবনের প্রতারণাতেও উচ্চবর্ণের মানুষ পিছিয়ে থাকেনি।

মনুসংহিতায় বিবাহ বিধান

এখানে আমরা মনুসংহিতার বিবাহ বিধান প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ উল্লেখ করছি। শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থ শ্লোকগুলির ভাষান্তর করেছেন মূল সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। মনুসংহিতার বিধানগুলিতে উগ্র জাতিভেদ প্রথার নিদর্শন পাওয়া যায়। একথা মনে করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না যে, প্রাচীন ভারতীয় জীবনের যৌন ব্যভিচার ও বিবাহের অসঙ্গতি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মনুসংহিতা কিছু কিছু বিধান দিয়েছে। এবার আমরা মনুসংহিতার বিবাহ বিধানগুলি আলোচনা করছি।

দ্বিজাতিগণের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্তা। কিন্তু স্বেচ্ছাবশত পুনর্বিবাহে প্রবৃত্ত হইলে এই সকল (পরবচনে বর্ণিত) স্ত্রী ক্রমশ শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। কেবল শূদ্রাই শূদ্রের ভার্যা হইবে, শূদ্রা ও বৈশ্যা বৈশ্যের বিবাহযোগ্য। শূদ্রা বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণের বিবাহযোগ্যা এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের ভার্যা হইবে। (কলিতে অনুলোম বিবাহ নিষিদ্ধ)। ইতিহাসাদি কোনও বৃত্তান্তে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে

বিপৎকালেও শূদ্রাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণের উপদেশ নাই। (প্রতিলোম বিবাহ একেবারেই নিষিদ্ধ কু-টি)। ১২-১৪। (তৃতীয় অধ্যায়)

দ্বিজাতিগণ মোহবশতঃ যদি হীনজাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই সন্তানের সহিত নিজবংশ আশু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৫। (তৃতীয় অধ্যায়)।

শূদ্রাতে গমন করিলে ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়, এবং তাহাতে পুত্র উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হইয়া যায়। ১৭। (তৃতীয় অধ্যায়)।

যে দ্বিজের দৈব, পৈত্রিক ও আতিথ্যকার্যে শূদ্রাই প্রধান, অর্থাৎ শূদ্রা গৃহিণীস্বরূপা হইয়া এই সকল কার্য্য করে, তাঁহার সেই হব্য-কব্য দেব ও পিতৃলোকেরা গ্রহণ করেন না এবং সেই গৃহস্থ ঐরূপ আতিথ্যাদি দ্বারা স্বর্গলাভও করিতে পারে না। ১৮। (তৃতীয় অধ্যায়)।

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধররস পান করেন, (এক শয্যায় শয়ন করিয়া) তাহার নিশ্বাস গ্রহণ করে এবং তাহাতে সন্তান উৎপাদন করে, তাহার নিষ্কৃতি নাই। ১৯। (তৃতীয় অধ্যায়)।

এবার মনুর বিধান বিভিন্ন প্রকার বিবাহ প্রসঙ্গেঃ জাতপাতের এক উগ্র সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

চারবর্ণের ইহ ও পরলোকের হিত ও অহিতজনক—স্ত্রীলাভের উপায়স্বরূপ আট প্রকার বিবাহ এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২০। (তৃতীয় অধ্যায়)।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও সর্বাপেক্ষা অধম পৈশাচ—এই আট প্রকার বিবাহ। ২১। (তৃতীয় অধ্যায়)।

যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্মসঙ্গত, যে বিবাহে যে গুণদোষ উৎপন্ন হয় ও যে বিবাহোৎপন্ন সন্তানে যে গুণাগুণ আসে আমি আপনাদিগকে সে সমুদয় বলিতেছি। প্রথম হইতে ক্রমে ক্রমে ছয়টি বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত। শেষ হইতে চারিটি বিবাহ অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ—এই চার প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবৈধ নহে। এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে রাক্ষস ব্যতীত এ কয়টি বিবাহ, অর্থাৎ আসুর, গান্ধর্ব ও পৈশাচ অনিষিদ্ধ বলিয়া জানিবে। ২২-২৩।

বিবাহ বিধানে মনুসংহিতায় জাতপাতের একটি চরম হাস্যকর নির্দেশ

আছে, যা প্রমাণ করে উচ্চবর্ণের এক অপ্রতিরোধ্য রক্তে নিহিত কমপ্লেক্স, কিন্তু কাম তাকে পরাজিত করেছে। মনু বলেছেন—

শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীরই পাণিগ্রহণের সংস্কারের বিধি আছে। অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণের পরিবর্তে বক্ষমান বিধি প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। ৪৩। (তৃতীয় অধ্যায়)।

যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবেন, তখন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের পাণি-গ্রহণ না করিয়া হস্তধৃত শর গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে বিবাহ করিলে, বৈশ্যা বরহস্তধৃত প্রতোদের (গো তাড়াইবার যষ্টির) একদেশ ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করিলে শূদ্রা ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পরিহিত বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবে। ৪৪। (তৃতীয় অধ্যায়)।

উপরে উদ্ধৃত, মনুসংহিতার বিবাহবিধান পড়ে মনে হয় কীভাবে উন্মাদের মত ঘৃণাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন শাস্ত্রকাররা। অথচ মনুসংহিতায় অনেক সংযত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তারও সাক্ষাৎ মেলে। ব্রাহ্মণকে অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী হবার নির্দেশ দিলেও বিবাহ ব্যাপারে এমন বিচিত্র জাতপাতের বিধান দিলেন কীভাবে মনু? যদি পাণিগ্রহণে এত প্রকার বিধিনিষেধ তবে নিম্নবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসঞ্চারে নিষেধ নেই কেন?—এই বিবাহ বিধান কি অন্তঃসারশূন্য নয়?

আজও মনুস্মৃতি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবহমান।

হিন্দু সমাজে জাতপাতের উৎসমুখ

'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'—কবির উক্তির মহত্ব উপলব্ধি করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের এই হিন্দু সমাজে মিলনসূত্র ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। কবি যদিও মনীষী এবং প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য অনুসারে তিনি ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ দার্শনিক, কিন্তু হিন্দু সমাজের জটিল সংশ্লেষ বুঝতে কবিবাক্য মনে হয় আবেগ আতিশয্য ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতের মত প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ কখনই জাতপাতের মত এক সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে রেহাই পায়নি। সত্যি সে অর্থে মিলনসূত্র এই সমাজকে বেঁধে রাখতে পারেনি। হিন্দু সমাজের মৌলবন্ধন হল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পক্ষছায়ায় রাজন্যশক্তির পক্ষপাতিত্বে সমাজ শাসন। সমাজে ব্রাহ্মণ ও রাজা বা জমিদার মহাজনরা একই শ্রেণী স্বার্থে সমাজে শাসন, শোষণ ও তোষণ করেছেন। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একই শাসনযন্ত্রের দুই মুখ ছাড়া অন্য কিছুই নয়! ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনুশাসন শুধু রাজ অনুমোদন লাভ করার জন্যই অনেক সময় নিছক রাজধর্ম বলে তা চালানোর চেষ্টা হয়েছে। যদিও মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, 'রাজন! লোকশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচরণকারী ক্ষত্রিয়গণের বাহু দ্বারা লোকসকলকে আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য, কারণ বেদে এই রূপ শ্রুতি আছে যে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের ধর্ম ও উপধর্ম সকল রাজধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।'

এই উক্তি মহাভারতে থাকলেও রাজধর্ম এক পাও নড়তে পারত না ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনুশাসন ছাড়া। তাই আমরা দেখতে পাই 'শুক্রনীতি' গ্রন্থে সমাজ পরিচালনা সম্পর্কে রাজার কর্তব্য বিষয়ের নির্দেশ, 'নিজ নিজ জাতির জন্য যে ধর্ম কথিত হইয়াছে, যাহা চিরকাল পূর্বজগণের দ্বারা আচরিত হইয়াছে, সে জাতি তদ্রুপ আচরণই করিবে। অন্যথা নৃপতির নিকট দণ্ডনীয় হইবে।......

'প্রতিদিবস দেশ এবং শাস্ত্রোক্ত হেতু সম্বন্ধে বিচার করিয়া জাতি, জনপদ, শ্রেণীকুলের ধর্ম কি তাহা বিবেচনা করিয়া রাজা তদনুসারে তাহার বিচার

করিবে, অন্যথা প্রজাগণ ক্ষুব্ধ হইবে। দাক্ষিণাত্যে দ্বিজগণ মাতুল কন্যাকে বিবাহ করে।'

রাজা শুধু দণ্ডদাতা কিন্তু জাতি, কুল, শ্রেণী এইসবের মূলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের শাস্ত্রীয় অনুশাসনই প্রধান তাই কখনই কোন সেক্যুলার চিন্তা আমাদের সমাজ অনুশাসনে ছিল না। জাতপাতের মস্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এদেশের রাজন্যশক্তিও। বেদের চতুর্বর্ণের সমর্থন করে অসংখ্য নিম্নবর্ণকে ঘৃণার অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয়েছে। পাদপ্রদীপের আলোতে কখনই তাদের আনা হয়নি। সমাজ সীমান্তের বাইরে সেই নীচবর্ণের অবস্থান।

ভারতবর্ষে লোকগণনা ১৮৭২ সালে আরম্ভ হয়। কিন্তু সেকাজ অসম্পূর্ণ-ভাবে করা হয়েছিল। ১৮৮১ সাল থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর এই গণনায় আমরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে খবর পাই। কিন্তু সমাজে এই স্তরসৃষ্টি কখনই স্বয়ংক্রিয় নয়। এর পেছনেও আছে সামাজিক-ভাবে উচ্চনীচ সৃষ্টির শাস্ত্রীয় বিধান। বেদের যুগ থেকে চতুর্বর্ণের সন্ধান মেলে। কিন্তু অসংখ্য উপবর্ণ বা সঙ্করজাতির সম্পর্কে যে উন্নাসিক ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে আছে হিন্দু সমাজে তার উৎসমুখটি খুঁজে বার করা জাতপাত ব্যাধির জীবাণু অনুসন্ধানের মতই গুরুত্বপূর্ণ। এই সমাজ প্রগতির যতই ঢাকঢোল পেটাক আজ অধিকাংশ তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দুর অন্তর্গত রক্তের ভেতর খেলা করে এক প্রচ্ছন্ন জাত্যাভিমান।

মনুসংহিতা সমগ্র হিন্দু সমাজের নিয়ন্তা। কবির স্বপ্নের ভারতবর্ষের ছিন্নবন্ধন মিলনসূত্রের নিদর্শন, আবার জাতপাতের উৎসমুখ বললেও ভুল হয় না। সমাজজীবনে হিন্দুদের এমন কোন ঐক্যসূত্র নেই যা দিয়ে উচ্চনীচ দুই শ্রেণীর মানুষ নিজেদের অভিন্ন ভাবতে পেরেছে। শুধু ধর্মে এক হলেই এক হওয়া যায় না, বর্ণে ও আর্থসামাজিক অধিকারে এক হওয়াই মূল কথা। সেইভাবে দেখলে কোনদিন হিন্দুসমাজে একতা ও সাম্য ছিল না। যা ছিল তা হল অনুশাসন আর বিধিবিধানের কণ্টকজালে আবৃত এক বিচিত্র সমাজব্যবস্থা।

মনুসংহিতা হিন্দু জাতপাতের আকরগ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থটি যেমন একদিকে সামাজিক অনেক ন্যায়নীতির বিধান দিয়েছে, তেমন আবার এমন অনেক বিধান দিয়েছে যা কখনই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। আমরা পূর্বে বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এমনকী বেদ,

শতপথব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকেও হিন্দুসমাজের সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবাদ বা জাত-পাতের সূত্রগুলি দেখাতে চেষ্টা করেছি। জাতপাতের মানসিক ইন্ধন মূলত এসেছে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রগুলি থেকে, তাই তাকে বাদ দিয়ে বা পাশ কাটিয়ে কোন ভাষ্য দেওয়া অন্ধের হস্তী (দর্শন)-বর্ণনার মত আংশিক সত্য। বিশেষত মনুসংহিতায় বর্ণ বিভাজনটি চতুর্বর্ণ থেকে ভিন্ন এক জটিল জাতিতত্ত্ব যা আজও হিন্দু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত। যদিও সমাজ অনেক সংস্কারমুক্ত হয়েছে, কিন্তু রক্তের ভেতরে জাতপাতের ব্যাধি সংক্রমণকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করতে পারেনি।

সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারত জাতপাতের তাণ্ডবে প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পযুদস্ত হয়েছে। দক্ষিণ ভারত একদা দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হয়েও উত্তর ভারতীয় আর্য ও ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার জাতিভেদের ব্যাধিতে জীর্ণ হয়েছে। নীচবর্ণের মানুষের ছায়া পর্যন্ত ব্রাহ্মণ স্পর্শ করলে অশুচি হবেন। এমন ভাবধারা গ্রামীণ ভারতীয় সমাজে ছিল এবং এখনও আছে। যেহেতু ভারত গ্রামপ্রধান সেহেতু গ্রাম ভারতের সামাজিক দর্পণই ভারতীয় সমাজ দর্পণ। সমাজের এলিটরা চিরকাল নগর সমাজের মুক্তচিন্তার মানুষ, সময়ানুসারে সুযোগসন্ধানী।

মনুসংহিতার কয়েকটি অধ্যায়ের মৌল বিষয়ের উল্লেখ করে, পরে দর্শন অধ্যায়ের সমাজনীতি সঙ্কর জাতির উৎপত্তি চারিবর্ণের আপৎকালে বৃত্তি-বিধানে সামান্য আলোকপাত করলেই আমরা সন্ধান পাব জাতপাতের উৎসমুখের। প্রথমে মনুসংহিতায় কয়েকটি মাত্র অধ্যায়ের শ্লোকের বিষয়ের ও সংখ্যার উল্লেখ করব :

১। প্রথম অধ্যায় : স্থূলরূপে পঞ্চভূতের ক্রমিক প্রকাশ (৬) অগ্রে জলের সৃষ্টি এবং তাহাতে বীজের আধান (৮) ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টি (৩১) মনুর উৎপত্তি (৩৩) কর্মানুযায়ী দেব ও মনুষ্যদিগের সৃষ্টি (৪১) ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পৃথক পৃথক কর্ম নিরূপণ (৮৭) ব্রাহ্মণের কর্ম, (৮৮) ক্ষত্রিয়ের কর্ম (৮৯) বৈশ্যের কর্ম (৯০) শূদ্রের কর্ম (৯১) ব্রাহ্মণের সম্পত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা (১০০-১০১), ব্রাহ্মণের শাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপনার অধিকার (১০৩)।

২। দ্বিতীয় অধ্যায় : কামনার মূল সঙ্কল্প এবং ব্রহ্মচর্যাদি ব্রত নিয়ম ও সঙ্কল্পজাত (৩) ধর্মশাস্ত্রাধ্যায়নে ও শ্রবণে দ্বিজাতির অধিকার (১৬)

ব্রহ্মাবর্ত দেশের আচারই সদাচার (১৮) দ্বিজাতীয় উপনয়ন-কাল (৩৮) পথ ছাড়িয়া দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তি (১৩৮ ১৩৯), চতুর্বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ (১৫৫) নীচকুলাদি হইতেও বিদ্যাদিগ্রহণ (২৩৮-২৪০) আপৎকালে ক্ষত্রিয়াদির নিকট অধ্যয়ন (২৪১-২৪২)।

৩। তৃতীয় অধ্যায়ঃ (ধর্ম সংস্কার প্রকরণ) বিবাহ বিচার ও কন্যা নির্বাচন (৫-১৯), অষ্টপ্রকার বিবাহ (২০-২৫), অসবর্ণা বিবাহবিধি (৪৪) স্ত্রীগমনকাল (৪৫) ঋতুকাল (৪৬), ভার্যাগমনে নিষিদ্ধকাল (৪৭), সালঙ্কারা কন্যাদানের প্রশংসা (৫৫), জারজ সন্তান (১৭৪-১৭৫)।

৪। চতুর্থ অধ্যায়ঃ (ব্রহ্মচর্য গার্হস্থাশ্রয় ধর্মপ্রকরণ) দ্বিজাতীর বৃত্তি নিরূপণ (১-১৩), স্নাতকের প্রকার ভেদ ও পূজা (৩১), রজস্বলাস্ত্রীগমনাদি নিষেদ (৪০ ২২), লোকব্যবহার (১৩৫-১৫৫)।

৫। পঞ্চম অধ্যায়ঃ (ভক্ষ্যাভক্ষ বিবেক, অশৌচ নির্ণয়, দ্রব্যশুদ্ধি ও যোষিদ্ধর্ম) অকালমৃত্যুর কারণ (৩-৪), লশুনাদি ভক্ষণ নিষেধ (৫-৬), নিন্দিতান্ন গ্রহণে প্রায়শ্চিত্ত (২১), অবৈধ ও বৃথা মাংস ভোজীর নিন্দা (৩৩-৩৮), শূদ্রের মাসে মাসে মুণ্ডন ব্যবস্থা (১৪০)।

মনু কে ?

এরপর ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম অষ্টম অধ্যায় এবং নবম অধ্যায়ের মৌল বিষয় 'আশ্রম ধর্মানুশাসন', 'রাজধর্ম ও রাজ্যরক্ষার্থ উপায়াদি বর্ণন', 'রাষ্ট্রনীতি', 'স্ত্রী পুরুষের ধর্ম' প্রভৃতি বিষয় শ্লোকগুলি জাতপাতের আলোচনার প্রাসঙ্গিক নয় বলে আলাদাভাবে উল্লেখ করলাম না। তবে দশম অধ্যায়ই জাত-পাতের জাতগৃহ বললে বোধহয় ভুল হয় না।

এবার দশম অধ্যায়ের আলোচনায় আসার আগে মনু কে—এ সম্পর্কে মনুর উক্তি উদ্ধৃত করছি, সনাতন হিন্দু সমাজে মনুর বিধানের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য।

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত আছে এইরকম—(শ্লোক সংখ্যা ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫)

সেই প্রভু আপনার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশে নারী ও পুরুষ হইলেন এবং সেই নারীতে বিরাট নামক পুরুষকে উৎপাদন করিলেন।

শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ! সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিলেন—

আমি সেই মনু। আমাকে সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানিও।

আমিও প্রজাসৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমে প্রজাপতিরূপে মরীচী, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ—এই দশজন মহর্ষির সৃষ্টি করিলাম।

ইঁহারা আবার মহাতেজস্বী অপর সাতজন মনুর সৃষ্টি করিলেন এবং যে দেবগণকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন নাই—সেইরূপ দেবতাদিগকে, তাঁহাদের বাসস্থান অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন কতিপয় মহর্ষিকেও সৃষ্টি করিলেন। (মনুসংহিতা/শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত—বঙ্গভাষানুবাদকসহিতা)

মনু বৃত্তান্ত জানার পর তাঁর আধিপত্য ও হিন্দুসমাজে মনুর বিধান যে অপ্রতিহত হবে সে বিষয়ে কোন সংশয় আর থাকে না। হিন্দু সমাজের সামাজিক অনুশাসনের তিনিই প্রাণপুরুষ এবং প্রধান নিয়ন্তা। মনু ঐতিহাসিক ব্যক্তি না সমাজ অনুশাসনের কল্পিত দৈবীপুরুষ এই বিতর্ক আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়, তাই তাঁর বিধানই আলোচনা করা যাক।

মনুসংহিতা—জাতিভেদের জাতগৃহ

মনুসংহিতায় চতুর্বর্ণ ছাড়াও সঙ্কর বর্ণের আলোচনা আছে। মনুর কঠোর বিধান আছে নিম্নবর্ণের মানুষদের অধিকার সম্পর্কে। খুব সূক্ষ্ম এবং অনেকক্ষেত্রে স্থূলভাবে অব্রাহ্মণ জাতির পরিচয় হীন ও হেয় করা হয়েছে। ভারতীয় সমাজে বর্ণসঙ্করের প্রধান প্রয়োজক যদি কেউ থাকে তা ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষরা। নিম্নবর্ণের মানুষ তাদের নিছক যৌনলালসার স্বীকার।

প্রথমেই মনু বলছেন (দশম অধ্যায়) শাস্ত্রে কথিত আছে দ্বিজন্মা বর্ণত্রয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, ইঁহারা সতত স্বধর্ম নিরত থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু বেদাধ্যাপনা কেবল ব্রাহ্মণেরই কর্তব্য কর্ম,—বেদাধ্যাপনা—কদাপি বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের কার্য নহে। (১) (শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গানুবাদ)

এবার ব্রাহ্মণ সম্পর্কে মনুর বক্তব্য হল 'সর্ববর্ণাগ্রজ এবং ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ'। তাই সব অধিকারের অধিকারী। যদিও মনুর মতে 'উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য—এই বর্ণত্রয় দ্বিজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন! উপনয়ন সংস্কার বিহীন বর্ণ চতুর্থবর্ণ শূদ্র তাই দ্বিজ নন। আমরা দেখতে পাচ্ছি মনুর বিধানে বৈশ্য পর্যন্ত উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হয়েছেন! অবশ্য আমাদের বাংলায় ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ এবং

ছত্রিশ জাতের ছড়াছড়ি। বল্লাল সেন অবশ্য সুবর্ণবণিকদের উপনয়ন সংস্কার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন ব্যক্তিগত ক্রোধ থেকে।

মনুসংহিতায় হীন জাতি সম্পর্কে বক্তব্য: মন্বাদি ঋষিরা বলিয়াছেন যে দ্বিজবর্ণত্রয় কতৃক অনুলোমক্রমে নীচ বর্ণের পত্নির গর্ভসম্ভূত তনয়েরা মাতার হীনজাতীয়তা প্রযুক্ত পিতৃজাতি প্রাপ্ত না হইয়া মাতৃসদৃশ জাতি হইয়া থাকে। (৬)। (শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গানুবাদ)

হিন্দু সমাজে মনুর বিধানে দুই প্রকার বিবাহ প্রতিলোম ও অনুলোম স্বীকৃত হয়েছে। বিবাহের পরিণাম 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'র সূত্র অনুযায়ী উচ্চ ও নীচ সন্তানের অধিকার ও জাতি সম্পর্কে মনু কোথাও খুবই উচ্চকিত আবার কোথাও ঘৃণার প্রচ্ছন্ন বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন। কোন মানবসন্তান যখন তার নিজের জন্মের জন্য দায়ী নয় তখন নবজাতকের ললাটে অপমানের পরিচয় চিহ্ন এঁকে দেওয়া হচ্ছে কার স্বার্থে অবশ্য মনুর মতে ব্রাহ্মণ যদি উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত না হন তাহলে সেই ব্রাহ্মণও 'ব্রাত্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় তারও ঔর্দ্ধদেহিকাদি পিতৃকার্যে অধিকার থাকে না।

ভারতীয় সমাজের আদিম কয়েকটি উপজাতির অস্তিত্বের কথা মনুসংহিতায় পাওয়া যায়। সেগুলি হল:

'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণাগর্ভজ তনয় দেশবিশেষে সপ্তবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা—'ঝল্ল', 'মল্ল', নিচ্ছিবি', 'নট', 'করণ', 'খস' এবং 'দ্রাবিড়'। ২২।

(শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গানুবাদ)

মনুসংহিতায় বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির পেছনে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের অবদানটি শুধুমাত্র স্বীকার করা হয়নি সেইসঙ্গে যৌন ব্যভিচারের কথাও বলা হয়েছে—'ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে পরস্পরের স্ত্রীগমন, সগোত্র বিবাহ, অবিবাহ্যা বিবাহ সংঘটন এবং উপনয়নাদি সস্বকর্ম্ম ত্যাগ ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে বর্ণসঙ্কর ঘটিয়া থাকে।' ২৩-২৪।

(শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গানুবাদ)

সঙ্কর জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে, মনু বলেছেন:

'পরস্পর আসক্তিবশত অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে যে সমস্ত সঙ্কর জাতি জন্মগ্রহণ করে, তাহা সমগ্রভাবে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২৫।'

'অধম চণ্ডাল, সূত, বৈদেহ, আযোগব, মাগধ এবং ক্ষত্তা—এই ছয়টি প্রতিলোমজ সঙ্করবর্ণ। এই ছয়টি সংস্করণ—সজাতীয়া, মাতৃজাতীয়া এবং

শ্রেষ্ঠজাতীয়া কন্যাতেও সদৃশবর্ণ তনয় উৎপাদন হইয়া থাকে। ২৬।

এরপর আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আরও অনেক নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে সঙ্করজাতিকে। এ যেন সঙ্করজাতির উৎপাদিত সঙ্করজাত। সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের মাঝে যেন তার ঠাঁই। মনু বলেছেন, 'আয়োগবাদি ষড়বিধ—সঙ্করজাতিরা পরস্পর অনুলোম বা প্রতিলোমক্রমে পরস্পর জাতীয়া পত্নীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন করে তাহারা তৎপিতা মাতা অপেক্ষা সর্বতোভাবে হীন, নিন্দার্হ ও সংক্রিয়া বহির্ভূত।' ২৯।

'নিষাদ কর্তৃক আয়োগব স্ত্রীগর্ভে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম মার্গব' বা 'দাশ', ইহারা নৌ কর্মোপজীবী। আর্য্যাবর্ত নিবাসীরা ইহাদিগকে কৈবর্ত্ত জাতি বলিয়া থাকে। ৩৪।

উচ্ছিষ্ট ভক্ষণশীলা এবং মৃতবস্ত্র, পরিধানকারিণী আয়োগবী স্ত্রীগর্ভে জনকভেদ 'সৈরিন্ধ্র' 'মৈত্রেয়' এবং 'মার্গব'—এই জাতিত্রয় জন্মগ্রহণ করে। নিষাদের বৈদেহীগর্ভসম্ভূত সন্তানের নাম 'কারাবর' ইহারা চর্মচ্ছেদকারী এবং বৈদেহজাতির কারাবর স্ত্রী হইতে 'অন্ধ্র' ও নিষাদ স্ত্রী হইতে 'মেদ' জাতি জন্মগ্রহণ করে, ইহারা গ্রামের বহির্দেশে বাস করে। ৩৫।

'চণ্ডাল হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে বেণুব্যবহারজীবী 'পাণ্ডুসোপাক' জাতির জন্ম, এবং নিষাদ হইতে বৈদেহিতে 'অহিণ্ডিকে'র জন্ম। চণ্ডালের পক্কসী স্ত্রীগর্ভে যে পাপিষ্ঠ জাতি জন্মে, তাহার নাম 'সোপাক' সাধুবিগর্হিত ও নিতান্ত পাপজনক জল্লাদের কার্য ইহাদের উপজীবিকা। চণ্ডালের নিষাদীগর্ভসম্ভূত যে সন্তান, তাঁহার নাম 'অন্ত্যাবসায়ী' (গঙ্গা পুত্র) শ্মশানকার্য ইহাদের উপজীবিকা এবং ইহারা যাবতীয় প্রতিলোম জাতিরও ঘৃণার্হ। ৩৬-৩৯।

(শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত বঙ্গানুবাদ)

মনুসংহিতায় কিন্তু ভারতীয় সমাজের বিচিত্র জাতিতত্ত্বের সন্ধান মেলে। শুধু বর্ণ ও কর্ম বিভাগ নয় সেই সঙ্গে সমাজের প্রত্যন্তবাসী মানুষের খবর যা আদমসুমারিতে ধরা পড়ার বহু আগে সংগৃহিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এ যেন জাতপাতের উৎসমুখ, ব্রাহ্মণ্যসমাজ যার ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যায় মুখর।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনুসংহিতায় ঘৃণার জারকরসে জারিত ভারতীয় সমাজের জাতপাতের মানসিকতা আমাদের ক্লান্ত ক্লান্ত করেছে অন্তর্গত রক্তের ভেতর খেলা করে। জানি না খেলার শেষ কোথায়?

জাতপাতের বন্ধনমুক্তিতে বাংলার বৈষ্ণব সমাজ

সারা উত্তর ভারত জুড়ে যখন ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির কঠোর অনুশাসন সমাজজীবনকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে। মনুসংহিতার বিধান তখন সমগ্র জীবনযাত্রার একমাত্র নিয়ামক। আহার-বিহার মৈথুনে কোন কিছুতে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির বাইরে চলার ক্ষমতা বা তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার উপায় ছিল না। হিন্দুত্ব মানেই ছিল আচারসর্বস্ব এক প্রাণহীন উগ্রতা ও উচ্চবর্ণের প্রাধান্য-বিস্তারের চেষ্টা। অবশ্য ভারতবর্ষের মানচিত্রে 'বাঙলা'-র স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সেই বৈদিক যুগ থেকেই। প্রসঙ্গত জানাই—'বাঙালি ব্রাহ্মণ' পর্যায়ের আলোচনায় আমি এই উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যভিমানীর চোখে বাংলা ও বাঙালিকে হেয় ও হীন করে দেখানোর উল্লেখ ও শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত করেছি। বহুদিন আগে বিনয় সরকার এই একই প্রসঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির রূপরেখাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'বঙ্গমাতা বীর প্রসবিনী। মহেঞ্জোদারীয় সভ্যতার কাল হইতে বুদ্ধদেবের আমল পর্যন্ত যে বঙ্গ-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে, বলা বাহুল্য তাহা নানা প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, কর্ম্ম, চিন্তা ও আদর্শের সমষ্টি। সে সবই 'দিগ্‌বিজয়ের' নিদর্শন, কেন না আমার মতে সংস্কৃতি-সৃষ্টি (বা আত্মপ্রকাশ) দিগ্‌বিজয়।'

'কিন্তু এই সকল রীতি-নীতি ও লেন-দেন যে সকল 'দিগবিজয়ী' বাঙালী আবিষ্কার, সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহারা কে? বর্তমান যুগের পরিভাষায় তাহারা নানা শ্রেণীর পারিয়া, ইতর, অস্পৃশ্য ও অনার্য ছাড়া আর কিছু নয়। এই সকল সংস্কৃতি-প্রবর্ত্তক বঙ্গসন্তান সেকালের মাপকাঠিতে 'ছোটলোক' বা 'হরিজন' মাত্র বিবেচিত হইত। তথাকথিত ইন্দো আরিয়ান বা 'আর্য্যেরা বাঙালী জাতকে 'বয়াংসি অর্থাৎ চিড়িয়া মাত্র সমঝিতে অভ্যস্ত ছিল। বৈদিক সাহিত্যের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া শতপথব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত নানা স্থানে বাঙলার নরনারীকে কাক-পায়রা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।' ('বাঙালামি'র জয়জয়কার। বিনয় সরকার)'

যে কোন নব্যচিন্তায় বাঙালির অবদান অনস্বীকার্য। যদিও আমরা আত্মবিস্মৃত,

আজ কিছুটা আত্মধিক্কারগ্রস্ত এবং সর্বভারতীয়ত্বের মিথ্যামোহে রাজনৈতিক প্রতারণার শিকার, তবুও বাঙালির মুক্তচিন্তার প্রবাহ কখনওই রুদ্ধগতি হয়নি। সারা ভারতে যখন মধ্যযুগীও অমানবিক জাতপাতের বিচারে মানুষরতন ঘৃণা আর উপেক্ষার অন্ধকারে পতিত হয়েছে তখনও বাংলার কবি চণ্ডীদাস সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল সত্যটি উচ্চারণ করেছেন তাঁর কাব্যে,—'সবার উপরে মানুষ সত্য।' শ্যামাঙ্গী বাংলা তাই উত্তর ভারতীয় পাথর-প্রতিম ধর্মের অনুশাসনকে অস্বীকার করতে চেয়েছে।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের দুই প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য শ্রীনিত্যানন্দ বোধহয় সারা ভারতে প্রথম জাতপাতের বন্ধনমুক্তির উদ্গাতা। এই দুই মহাপুরুষ শুধু ধর্মের মাহাত্ম্য কার্তন করে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মধ্যে দিয়ে তাঁদের ধর্মসাধনা শেষ করেননি, তাঁরা মানুষকে মন্ত্র হংস ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে তাঁরা সমাজ-বিপ্লবী। বাংলার জীবনে তাদের এই বিপ্লব তরঙ্গটির একটা রূপরেখা হল এই আলোচনার প্রসঙ্গ।

শ্রীচৈতন্য শুধু অচণ্ডাল ব্রাহ্মণকেই তাঁর প্রেম ধর্মে মাতাননি যবন হরিদাসও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সম্মানিত নাম। এই যবন হরিদাস যখন উচ্চৈস্বরে হরিনাম কীর্তন করতেন তখন নদীয়া জেলার হরিনদী গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ তাঁকে হরিনাম উচ্চারণের জন্য তিরস্কার করেন। হরিদাস সেই ব্রাহ্মণকে নাম মাহাত্ম্য ও শাস্ত্রতত্ত্ব যখন শোনালেন তখন ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলেন,—

'দরশনকর্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে কালে বেদপথ হয় দেখি নাশ॥'

ব্রাহ্মণকে যবন হরিদাস শাস্ত্রতত্ত্ব শোনাবে এতো সেযুগে কল্পনাও করা যেত না। হিন্দুত্বের গোঁড়ামিতে একমাত্র ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করলেই শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার মিথ্যা অভিমান সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বলছেন,—

'এসকল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নামমাত্র।
এইসব জন যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্রঘরে।
সুজনেরে হিংসা করিবারে॥'

শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার শ্রীবৃন্দাবনদাস নিজে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেও তিনি তাঁর উক্তির সমর্থনে বরাহপুরাণের শিব বচন উদ্ধৃত করেছেন।

'কলিযুগকে আশ্রয় করিয়া রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিবে এবং তখন

শ্রোত্রিয়দিগকে বাধা প্রদান করিবে।'

ভক্তচূড়ামণি যবন হরিদাসের এই তিরস্কার প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনদাস পদ্ম-পুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন,—

'কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবা।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনপি বর্জ্জয়েৎ॥'

অর্থাৎ 'আর অধিক কি বলিব ব্রাহ্মণ হইয়া যাহারা অবৈষ্ণব, ভুলিয়াও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শ করিবে না।' এই কথার মধ্যে কোন ঘৃণা বা দ্বেষ নেই আছে জাতপাতের বিরুদ্ধে ব্রাত্যজাতিহীনের মানুষ্যজাতের জাতবিচার।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে জাতপাতের কোন সংস্কারই মানতেন না তা তাঁদের উচ্চনীচের ভেদজ্ঞানহীন পঙক্তিভোজনে প্রমাণ করে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে শচীমাতা যখন নিজের হাতে রান্না করে সঙ্গোপাঙ্গসহ খাওয়াচ্ছেন তখন ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্বিচারে সকল ভক্ত তাঁর অবশেষ প্রসাদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগলেন।

'আচমন করি নাম ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষে লুটিতে লাগিলা॥
কেহ বোলে 'ব্রাহ্মণে ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি আমারে সে উচ্ছিষ্ট জুয়ায়'॥
আর কেহ বোলে 'আমি নাহিরে ব্রাহ্মণ।'
আড়ে থাকি লই কেহ করে পলায়ন॥
কেহ বোলে 'শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে'।
হয় নয় বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্র কহে॥
কেহ বোলে 'আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাতখানি মাত্র আমি লই যাই'॥
কেহ বোলে 'আমি পাত ফেলি সর্ব্বকাল।
তোমরা যে বহ সে কেবল ঠাকুরাল॥'

এই বর্ণনা থেকে একথাটা স্পষ্ট হয় যে, সমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মানসিক অবস্থা কী ছিল! স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য কীভাবে সমাজে মানা হত। নিমাই পণ্ডিত শচীমাতাকে বলেছিলেন,—

'চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অন্যপথে চলে॥'

খাদ্য-পানীয় গ্রহণের মধ্যে এতদিন যে হিন্দুসমাজের কঠোর নিয়মগুলি মানা হত যা থেকে জন্মলাভ করেছিল জাতপাতের ভেদাভেদ, শ্রীচৈতন্য তার মূলে আঘাত করলেন। খোলাবেচা শ্রীধরের ভাঙা পূর্ণকুটিরে নিমাই যখন কাজিদলন করে সদলবলে হরিনাম কীর্তন করতে করতে প্রবেশ করলেন, তখন দেখতে পান,—

'সবে এক লৌহপাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঞি তালি তাহা চোরেও না হরে॥'

চৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে নৃত্য করতে করতে সেই লৌহ পাত্রের জল পান করেন। সেই দৃশ্য দেখে শ্রীধর যখন আর্তস্বরে বিলাপ করেন, তখন মহাপ্রভু বলেন,—'প্রভু বোলে শুদ্ধ মোর আজি কলেবর।'

অগণিত নবদ্বীপবাসীর চোখের সামনে কীর্তনানন্দে যখন মহাপ্রভু বলেন যে, 'আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণচরণে'। দেহশুদ্ধি ও কৃষ্ণচরণে ভক্তি দুই হল শ্রীধর-অঙ্গনে জলপান করে।

নিত্যানন্দ স্ত্রী-শূদ্রের বিচার করতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের এক সতীর্থ পুরীধামে গিয়ে নিত্যানন্দের কাছে এই বলে অভিযোগ করেছিলেন যে, সন্ন্যাসী হয়ে তিনি (গৌরাঙ্গ) কর্পূরবাসিত পান খান, কৌপীন ছেড়ে পট্টবাস পরেন এবং শূদ্রের আশ্রমে সর্বক্ষণ থাকেন। রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস জাতিবর্ণ নির্বিচারে বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট খেতেন এবং ঝড়ু ভুঁইমালীর পদধুলি নিতে উদগ্রীব হয়েছিলেন। ঝড়ু পদধুলি দিতে অস্বীকার করায় কালিদাস পথে নিক্ষিপ্ত তাদের উচ্ছিষ্ট আমের আঁটি বৈষ্ণব প্রসাদ হিসাবে চুষেছিলেন। ঝড়ু যে পথ দিয়ে তাঁকে সম্মানসহকারে এগিয়ে দিয়েছিল তিনি সেই পথের ধূলি ভক্তিভাবে গ্রহণ করেন।

বাংলার বৈষ্ণব সাধকরা দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা বিশ্বাস করতেন যে,— 'চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিলে যে আমার ভক্ত হয় তাহা নহে, চণ্ডাল যদি আমার ভক্ত হয় তবে সে আমার প্রিয়। সে যাহা আমাকে দান করে আমি তাহা গ্রহণ করি এবং সে আমারই মত পূজ্য।'

'শুচিঃ সদ্ভক্তি-দীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতি কল্মষঃ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নাস্তিকঃ॥

অর্থাৎ, 'শুদ্ধাভক্তির প্রদীপ বহ্নিতে হীনজাতির পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাদৃশ চণ্ডালকে সম্মানার্হ জ্ঞান করেন কিন্তু নাস্তিক বেদজ্ঞ

হইলেও শ্লাঘ্য হন না।'

'চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ'

অর্থাৎ 'হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ।' এই চণ্ডালকে হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্র অন্ত্যজ বলে যেভাবে সমাজের সর্বনিম্নস্তরে পতিত করেছে, সে দেশে এক পরম ধার্মিক শাস্ত্রজ্ঞ ভাগবতপন্থীর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার হচ্ছে এ নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক প্রয়াস। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ ভারতের যথার্থ হরিজনদের আধ্যাত্মিক অধিকার কায়েম করেছিলেন। বাংলার বৈষ্ণব সমাজের ব্রাহ্মণেতর জাতির এই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতির প্রমাণ শুধু জাতি বর্ণ হিসাবে হিন্দু ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভিন্ন ধর্মী যবন হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য কত গভীরভাবে তাঁর জীবনের অধ্যাত্মসঙ্গী বলে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য প্রত্যাগমনের পর পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এলে গৌড়দেশের ভক্তগণ তাঁকে দর্শনের জন্য কাশী মিশ্রের গৃহে সমবেত হয়েছেন কিন্তু হরিদাস এঁদের মাধ্য নেই।

হরিদাস রাজপথে মহাপ্রভুকে দর্শন করে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি ভক্তদের অনুগমন করতে পারেননি। হরিদাস রাজপথের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এদিকে মহাপ্রভু হরিদাসকে তল্লাস করেছেন জেনে,—

'ভক্তগণ ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে॥
হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥'

কাশী মিশ্রের নিভৃত পুষ্পোদ্যানে মহাপ্রভু ও হরিদাস মিলিত হয়েছেন, সেইখানে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বর্ণনা করছেন—

'দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল প্রভু ভৃত্যগুণে॥
হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইয় মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥

নিরন্তর চারিবেদ কর অধ্যয়ন ।
দ্বিজ ন্যাসী হতে তুমি পরম পাবন ॥'

ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর থেকে তুমি পরম পবিত্র—এই বলে মহাপ্রভু শ্রীমদ্-ভাগবতের শ্লোক উচ্চারণ করলেন—

'অহোবত শ্বপচোহতো গরীয়ান্ ।
যজ্জিহব্যগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ॥
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সম্নুরার্য্যা ।
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥'

(ভাগবত ৩/৩৩/৭)

অর্থাৎ—'হে প্রভু ! যাহার জিহ্বায় তোমার নাম বিদ্যমান থাকে সে চণ্ডাল হইতেও শ্রেষ্ঠ । কেন না তোমার নাম যাঁহারা কীর্তন করেন তাঁহারা অখিল তপস্যা করিয়াছেন, সর্বপ্রকার যজ্ঞ ও হোম করিয়াছেন, সকল তীর্থে স্নান করিয়াছেন, তাঁহারা যথার্থ আর্য ।'

যবন হরিদাসের উক্তির মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যে নানা রকমভাবে অন্ত্যজ ও যবনশ্রেণীর মানুষ উচ্চবর্ণের স্পর্শ বাঁচিয়ে অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে, ভয়ে এবং মানসিক আড়ষ্টতায় বেঁচে ছিল । তা না হলে হরিদাস বলতে পারতেন না,—'প্রভু না ছুঁইয় মোরে । মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥' এ হল সে যুগে সমস্ত নিম্নবর্ণের মানুষের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ।

বাংলার বৈষ্ণবতীর্থ ঃ শ্রীপাট

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যই প্রথম সমাজের অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ যবনকে বললেন, 'দ্বিজ ন্যাসী হতে তুমি পরম পাবন ।' এছাড়া সারা ভারতে বিশেষ ভাবে যা লক্ষণীয় তা হল তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডা পুরোহিত শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারে মূলধন ছিল জন্মসূত্র ব্রাহ্মণ হওয়া, সেই মূলধনী ধর্মব্যবসায় মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল । বাংলার বিভিন্ন স্থানে বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের জন্য আশ্রম স্থাপিত হয়েছিল, সেইগুলি পরবর্তীকালে বৈষ্ণব তীর্থ হিসাবে গণ্য হয় ।

যদিও এই তীর্থগুলি জীর্ণ ও প্রাণহীন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তবুও এই তীর্থগুলিকে বাংলার শ্রীপাট বলে ।—এইসব শ্রীপাটগুলির কয়েকটি ব্রাহ্মণেতর নিম্নবর্ণ ভক্তের পবিত্র স্মৃতি হিসাবে বৈষ্ণব সমাজে মহিমান্বিত ।

বাংলার তথাকথিত নিম্নতর জাতি ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে উচ্চ সামাজিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তার প্রমাণ এই শ্রীপাটগুলি—

মহেশ, উদ্ধারণপুর, শীতলগ্রাম, খানাকুল, পালপাড়া, সুখসাগর, বোধখানা, কালনা (অম্বিকা), শ্রীখণ্ড, কাঞ্চনপুর, জিরাট, চাখণ্ডী, কোগ্রাম, রাজশাহী, আমহাটি, খেতুড়, হারীট, পানিহাটি, খড়দহ প্রভৃতি বাংলার বৈষ্ণব তীর্থ বা শ্রীপাটগুলির ইতিহাস পাঠ করলে বাংলার নিম্নবর্ণের মানুষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অধিকারলাভের কথাও জানা যাবে। জানা যাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের জাতপাতের বন্ধনমুক্তির ইতিহাস।

শুধু কি বাংলাদেশ? মধ্যযুগে দাক্ষিণাত্য, উত্তরখণ্ড, পশ্চিম ও পূর্বভারতের ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ বৈষ্ণব আন্দোলনে ভিত্তিভূমিতে নাড়া খেয়েছিল। নিম্নতর জাতি, স্ত্রী শূদ্রনির্বিচারে সকলকে সব অধিকার বৈষ্ণবসমাজ দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশে বৈষ্ণব আন্দোলনের কয়েকজন নেতা ও ধর্মগুরু ছিলেন স্ত্রীলোক। নিম্নজাতির মধ্যে—বিধবাবিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ও চুক্তিশর্তে বিবাহ বর্তমান ছিল। এইভাবে পতিত বৈষ্ণব সমাজে স্থান পেল। ধর্ম ও সামাজিক জীবনে জাতপাতের ভেদ মুছে শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সমাজ প্রগতির পথ দেখালো। যে পথ রামরাজ্যের মত শুধু স্বপ্নবিলাসের সামগ্রী নয়, বাস্তব একান্তই জীবনমুখীন।

'লালন কি জাত সংসারে'

বাংলার লোকায়ত জীবনের ধর্ম সাধনায় এদেশের বিরাট সমাজবিপ্লব খুব নীরবে ধীরে ধীরে সাধিত হয়েছে। যে মুক্তচিন্তার বাতাবরণ লোকায়ত ধর্মগুরু করেছিলেন আজও তা কেতাবী শাস্ত্রমানা উচ্চসমাজ করতে পারেননি। ভারতবর্ষ সাম্প্রদায়িক বিভেদে দীর্ঘকাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, শুধু মাঝে মাঝে ঐক্যের ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে। শুধু হিন্দু সমাজের বর্ণভেদের লড়াই নয়, ভারতীয় সমাজের দুই নিকটতম প্রতিবেশী হয়তো বা রক্তেও অভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর জাতপাতের অন্ধ আক্রোশে এক হতে পারেনি কখনও।

ভারতের ধর্মজীবনে সুফীদের প্রভাবে অবশ্য এক ঐক্য ও মরমী ভাবের উন্মেষ হয়েছিল। এই সুফী সাধনায় মানুষের ভেদ-বিভেদে কোন বেড়া নেই, আর তাই তা ভারতীয় লোকায়ত জীবনের ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। আমরা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে যাবার আগে বাংলার লোকায়ত জীবনের হিন্দু ও মুসলমান সমাজের দ্বন্দ্ব মিলনের ছবিটি তুলে ধরতে চেষ্টা করব। এই আলোচনার মুখবন্ধ হিসাবে বাংলার মুসলমান সমাজের জাতপাত সম্পর্কিত একটি তথ্য উদ্ধৃত করছি এক মুসলমান লেখকের গ্রন্থ থেকে। শুধু যে হিন্দু সমাজ জাতপাতে বিভক্ত তাই নয়, এই তথ্যে জানা যাচ্ছে মুসলমান সমাজও জাতপাত ব্যাধিতে আক্রান্ত।

ইয়াকুব আলী (বি এ) প্রণীত 'মুসলমানের জাতিভেদ' গ্রন্থ মতে, '১৯১১ খ্রীস্টাব্দে আদমসুমারী বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশীয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ৮০ প্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যা ও তাহাদের জাতি নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে মুসলমানগণের এই প্রকার জাতিভেদ এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, পৃথিবী পৃষ্ঠে অপর কোন দেশে মুসলমান সমাজে এরূপ জাতিভেদ প্রচলিত নাই।'

লেখক মুসলমান সমাজে জাতি গণনায় তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন,— 'কিন্তু এ দেশে মুসলমানের জাতিভেদ প্রকরণে কেবলমাত্র সেন্সাস কর্তৃপক্ষের

দোষ নির্ণয়ে একদেশদর্শিতা প্রকাশ পাইবে। এ দেশীয় অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত মুসলমানগণও প্রতিবেশী হিন্দুর জাতিভেদের অনুকরণে আপনাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দুর সহিত একত্র বসবাস করিয়া হিন্দুর প্রভাব মুসলমানের সমাজে বিস্তৃত লাভ করিয়াছে। অপরদিকে মুসলমানগণ সাধারণ অশিক্ষিত বলিয়া ইসলামী আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে।······ অধিকন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বল্পকাল মুসলমান সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বংশ-পরম্পরাগত জাতিভেদ সংস্কার প্রভাবে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত রইয়াছেন। সুতরাং মুসলমান সমাজের অপরিচিত এই ভেদনীতি মূলে ভারতীয় মুসলমান সমাজে হিন্দু প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।'—পৃঃ ১৬।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদার ইসলামী সমাজে হিন্দু প্রভাবেই হোক বা অন্য কোন আর্থ-সামাজিক কারণই হোক জাতিভেদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দু সমাজ তো জাতপাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, এখন প্রশ্ন এই দুই সম্প্রদায় নিজেদের অভ্যন্তরীণ সামাজিক আত্মকলহে যখন বিপর্যস্ত তখনও কিন্তু পরস্পর বিবাদমান, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না। একে অন্যের মতকে ও পথকে অস্বীকার করছে, হেয় ও হীন করছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ভারতের ইতিহাসে এই দুই সম্প্রদায় থেকে অনেক উদার মানবপ্রেমী লোকায়ত জীবনের ধর্মসাধনায় গড়ে তুলেছেন এক বিশ্বমানবিক ধর্ম। যে ধর্মে নেই জাতপাতের বালাই, নেই উচ্চ ও নীচ কুলের বাছবিচার।

বাংলার সমাজজীবনের মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পর লোকজীবনে সব থেকে যিনি বেশি প্রভাবশালী তিনি হলেন সাধক কবি লালন ফকির। যাঁর প্রভাবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এদেশের এক ভেদবুদ্ধিহীন লোকায়ত জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বার বার অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন পদ্মাপারের উদার ঈশ্বরপ্রেমী বাউল ও বাউলরাজ লালন ফকিরের অবদানের কথা। রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে ১৯৩০ সালে হাবার্ট বক্তৃতামালায় লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' এই বিষয়বস্তু ও বাউলতত্ত্ব প্রসঙ্গে 'The Man of My heart'-এ সশ্রদ্ধচিত্তে এই লোক-মনীষীর কথা স্বীকার করেছেন। এছাড়া আচার্য ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীও লালন ও বাউলতত্ত্বের আলোচনায় তথাকথিত শিক্ষিত সমাজকে এক ভেদবুদ্ধিহীন মুক্ত সমাজের সন্ধান দিয়েছেন। এদেশের হিন্দু ও মুসলমান কোন সম্প্রদায়ই সেই মুক্তসমাজ বাস্তবায়িত করতে কখনই পারেনি। শাস্ত্র ও উচ্চস্তরের দার্শনিক

চিন্তায় মানুষকে যতই পারমার্থিক স্বীকৃত দেওয়া হোক, কখনই আর্থসামাজিক জীবনে ও ধর্মজীবনে ভেদবুদ্ধিলুপ্ত হয়নি।

লালন ফকিরের ব্যক্তিজীবনই হল এদেশের জাতপাতলাঞ্ছিত সমাজের মস্ত বড় উদাহরণ। লালনের সাধক জীবনকথা আজও স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও অসংখ্য গানের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় তাঁর মত ও পথ। লালন সম্পর্কে নানা পরস্পরবিরোধী কথা প্রচলিত আছে। যে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে জানা গেছে তিনি ছিলেন হিন্দুর সন্তান। অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যান। ফেরার পথে মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর সহযাত্রীরা তাঁকে ফেলে গ্রামে গিয়ে রটিয়ে দেন যে, তিনি মারা গেছেন। সিরাজ ফকির নামে একজন পাল্কিবাহক তাঁকে পথ থেকে তুলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলেন। সিরাজ ফকিরের স্ত্রীও লালনের সেবাযত্ন করেন। লালন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন, কিন্তু মুসলমানের অন্নগ্রহণ করায় তাঁকে হিন্দু সমাজে স্থান দিল না আত্মীয়-পরিজনরা। স্ত্রীও জাতিচ্যুত স্বামীর অনুগামী হতে অস্বীকার করেন। লালন তখন বিক্ষুব্ধচিত্তে সিরাজ সাঁইয়ের কাছে ফিরে এসে তাঁকেই গুরুপদে বরণ করেন। ১৮২৩ সাল নাগাদ লালন নানা তীর্থ পর্যটনের পর কুষ্টিয়ার গোরাই নদীর ধারে সেঁউড়িয়া গ্রামে জোলাজাতীয় এক মুসলিম স্ত্রী গ্রহণ করে বাস করতে থাকেন।

কুমারখালির কাছাকাছি কোন গাঁয়ে লালনের পৈত্রিক নিবাস ছিল। সিরাজ সাঁইয়ের বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার কালুখালি স্টেশনের কাছাকাছি কোন গাঁয়ে। ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে লালনের জন্ম এবং ১৮৯০ খৃস্টাব্দে ১৪ অক্টোবর শুক্রবার সেঁউড়িয়া গ্রামে দেহত্যাগ করেন। এখানে লালন ফকিরের মাজার আছে। কেউ বলেন তাঁর পূর্বজীবনের হিন্দুকুল পরিচয় ছিল 'কর' উপাধিতে, আর কারো মতে 'দাস'। লাললেন জীবনের মধ্যেই কি আমরা আমাদের সমাজচিত্র পেলাম না? —যে সমাজ জাতপাতের হৃদয়হীন মানবতার শবাগার।

পণ্ডিতরা মনে করেন মোটামুটি সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদে বাউল মনের উন্মেষ হয়। মুসলমান মাধববিবি ও আউলচাঁদই এ মতের প্রবর্তক। মাধববিবির শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রই বাউল মত নাকি জনপ্রিয় করেন। উনিশ শতকে লালন ফকিরের সাধনা ও বাউল গানের রচনার মধ্যে দিয়ে বাউল-

তত্ত্ব পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

মুসলিম বিজয়ের পর হিন্দু মুসলমান বিপরীতমুখী ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘর্ষে প্রথমে দক্ষিণ ভারতে, পরে উত্তর ভারতে এবং সবশেষে বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নেই এক ধর্মসমন্বয় ও জাতপাতহীন সমাজ সৃষ্টির প্রয়াস শুরু হয়। হিন্দুর মায়াবাদ ও তজ্জাত ভক্তিবাদ, ইসলামের সুফীতত্ত্ব এই আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছে। উত্তর ভারতে সন্তধর্ম, দক্ষিণ ভারতে ভক্তিধর্ম আর বাংলার বৈষ্ণব ও বাউল মতবাদই হল সুফীমতের প্রত্যক্ষ প্রভাব। জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার স্থিতি, 'আত্মাংবিদ্ধি' এবং হাদীসের 'মানআরাফা নারুসাহু ফাকাদ আরাফা বাররাহু'—অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে। সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের নির্যাস হল মানুষের নিজেকে চেনা এবং উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধির নাশ হওয়া। ধর্ম হল অনুভবের, শুধু আচারসর্বস্ব নয়।

বাংলার বাউল সম্পর্কে আচার্য ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি, তাতেই বোঝা যাবে এই সম্প্রদায়ের জাতপাতের বন্ধনমুক্তির চিত্রটি,—'বাংলার বাউল ও জিকির বলিয়া যে সব মণ্ডলী আছে তাহাদিগকে না বলিতে পারা যায় কোনো জাতি, না বলা যায় কোন সম্প্রদায়। তাহারা না মুসলমান না হিন্দু। এই বাউল বা গৃহস্থ বাউল, তাঁহারা কতক পরিমাণে মুসলমানও বটেন। তাই নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা ফতোয়া দ্বারাই ইহাদের সংখ্যা লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ বাউল-বিধ্বংস ফতোয়া আমি দেখিয়াছি। রংপুর জেলায় পার্বতীপুরের কাছে বাঙ্গালপাড়ায় ও অন্যান্য কোনো কোনো স্থানে, বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের কতকগুলি স্থানে বাউল জাতি আছে। ধর্মের বাউল ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ময়মনসিংহের পূর্বভাগে মেঘনাতীরে জিকির জাতি আছে। এই উভয়শ্রেণীরই হিন্দু মুসলমান উভয়বিধ গোঁড়ামির কোনটাই নাই। ইহারা গানে সাধনা করেন ও ইহাদের মতামত খুব উদার। খানিক বৈষ্ণব খানিক সুফী অনুপ্রাণিত।

'এই পর্যন্ত যাঁহাদের নাম করা গেল তাঁরা প্রায় অনেকেই নিজেদের মুসলমান নামে পরিচয় দিয়াছেন—যদিও নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা বলিয়াছেন এসব আচার বা-শরা বা শাস্ত্রসম্মত নহে।' (ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, পৃঃ ৪১) এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী আরেকটি অসাম্প্রদায়িক পন্থার কথা জানিয়েছেন। তারা হল ফরিদপুরের হাজী শরিয়ত অল্লার প্রবর্তিত পথের ওয়াহাবী। তাঁর জন্ম জোলার বংশে। তিনি মক্কা

গিয়েছিলেন, তাহির অল মক্কীর শিষ্য হন। তিনি ঈদ, জুম্মা, নামাজ, পীর, দরগাহ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেন, কারণ ভারত হল অমুসলমান রাজার অধীন 'দারুলহর্ব' অর্থাৎ যুদ্ধস্থান। প্রত্যেকের খুব আচারী মুসলমান হতে হবে। তাঁর (শরিয়ত অল্লা) পুত্র মুহম্মদ মুহসিন বা দুধু মিয়া তার সম্প্রদায়কে নানা মণ্ডলে ভাগ করেন। তাঁরা প্রচার করলেন সম্প্রদায়ে ধনী-দরিদ্রে ভেদ নেই। বিপদে একত্রিত হয়ে বিপন্নকে সাহায্য করতে হবে। তাঁদের মতে পৃথিবী ভগবানের, তাই কেউ পুরুষানুক্রমে তা অধিকার করতে বা কর নিতে পারেন না। তাই বাংলার শোষক শ্রেণী নীলকর, জমিদার এবং গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় সমবেত হয়েও এদের সঙ্গে লড়াইতে এঁটে উঠতে পারেননি। শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলন হল ওয়াহাবীদের।

এই সমাজে শুধুমাত্র মুসলমানের অন্নগ্রহণ করার জন্য অন্যায়ভাবে জাতিচ্যুতির লাঞ্ছনা লালনকে সহ্য করতে হয়েছে, তিনি সেই সমাজের লোক-সাধারণের উদ্দেশ্যে শুনিয়েছেন তত্ত্বকথা।

এমন মানব জনম আর কি হবে
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে।
অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই
শুনি মানবের উত্তম কিছু নাই
দেব দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।

লালন তাঁর গানে বহুভাবে স্বীকার করেছেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই জাত ধর্মের ঊর্ধ্বে যে মানুষরতন তার কথা। যে মানুষের হদিশ শাস্ত্রের পাথি পড়া পণ্ডিতরা জানতো না—

'এই মানুষের আছেরে মন,
যারে বলে মানুষরতন।'

সমস্ত প্রকার সংকীর্ণ জাতিগত ভেদবিচারের ঊর্ধ্বে এক নির্বিশেষ মানবপ্রীতি ছিল লালন শাহের ধর্মজীবনের মূল নীতি। যেখানে হিন্দু-মুসলমান কোন সমাজেরই গোঁড়ামি দানা বাঁধতে পারেনি। তাই তিনি নিজের জাতির পরিচয় দিয়েছেন—

সবাই শুধায় লালন ফকির
কোন জাতির ছেলে
কারে বা কি বলবো আমি
দিশা না মেলে।
হয় কেমনে জাতির প্রমাণ
হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্ট-যবন :
'জাত' বলিতে কি হয় বিধান
শাস্ত্রে খুঁজিলে ?
স্বেদ-অণ্ড-জরায়ু ধরে
একে একেশ্বর সৃষ্টি করে
আগম-নিগম চরাচরে
তারে ভিন্ন জাত বলে ?
মানুষের কি হয় জাতির বিচার ?
এক এক দেশে এক এক আচার
লালন কয় জাতির ব্যবহার
গিয়াছে ভুলে ॥

লালন বেদনার্ত কণ্ঠে জাত্যাভিমানী হিন্দু-মুসলমান দুই সমাজের মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

বিভিন্নতা করিওনা জাতিধর্ম বলে।
আলেখ অধর সেই দয়াময় সাঁই।
সৃষ্টি স্থিতি জুড়ে তার জাতি গোত্র নাই।
জাতি ধর্ম-কুল গোত্র মানুষের সৃজন।
ভিন্ন বলে কিছু আমি দেখি না কখন।
সকল জনার মাঝে একই সেই ঈশ্বর।
নানারূপে নানা স্থানে করেন বিহার ॥

কিংবা

যবন কাফের ঘরে ঘরে
শুনে আমার নয়ন ঝরে ॥
লালন বলে মারিস কারে
চিনলিনে মনের ধোঁকায় ॥

লালন তাঁর প্রথম জীবনে যেমন হিন্দু সমাজের জাতপাতের শিকার হয়ে ঘর-সংসার-স্ত্রীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে ধর্ম সাধনায় যখন জীবনসত্য লাভ করে তার ভাবে ভাবুক করে তুলছিলেন সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষকে, তখনও বাধা এসেছিল। সে সম্পর্কে জানা যায় যে, লালন মত বিস্তৃতিলাভ করাতে শরিয়তপন্থী মুসলিম সমাজ বেশ বিব্রত হয়ে পড়ে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করতে তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে লালনকে তারা নাসারা, কাফের, নেড়ার ফকির, ভেদো ফকির প্রভৃতি আখ্যা দেয়। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, শরীয়তবাদী মুসলমানেরা কোন দিন লালনকে ভাল চোখে দেখেননি এবং এই বাউলপন্থী নেড়ার ধার্মিকেরা চিরকাল ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছেন।

তবুও লালন-শাহের জীবন দিয়ে প্রমাণ হয়েছে এদেশে কী হিন্দু কী মুসলমান কোন সম্প্রদায়ই সহজ মানবসত্তাকে পথ ছেড়ে দেয়নি। মানুষের মিলনে নিজেদের গোষ্ঠি বা শ্রেণী স্বার্থে জাতপাতের পাঁচিল তুলেছে। সে পাঁচিল জীর্ণ কিন্তু আজও ভেঙে পড়েনি। লালনের গান দিয়ে প্রসঙ্গটি শেষ করছি।

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয় জেতের কিরূপ দেখলাম না এ নজরে॥
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান
নারী লোকের কি হয় বিধান।
বামন চিনি পৈতে প্রমাণ
বামনী চিনি কি ধরে॥

লালনের জীবন ও সাধনা হল বাঙালির জাতপাতের শেষ কথা।

স্বামী বিবেকানন্দর চোখে ভারতের জাতিভেদ

এক উদার উদাস সন্ন্যাসী হৃদয় অথচ সমাজবিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক ও মেধা নিয়ে বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখেছেন। সন্ন্যাসীর উদাস হৃদয়ে যেমন দার্শনিক চিন্তার উন্মেষ হয়েছে, তেমন বিজ্ঞানীর বীক্ষণ দৃষ্টিতে এই সমাজের পরতে পরতে জমে থাকা অন্যায়, অবিচার ও নীতিহীনতা তাঁকে আলোড়িত করেছে। ধর্মকে বর্ম করে যাঁরা আত্মপ্রতারণার পথ বেছে নেয় তাঁদের চোখে সমাজের অন্যায়, অবিচার, জাতিভেদ সব কিছুই ঈশ্বরের অভিপ্রায়, তাই তাদের পক্ষে ধাপ্পা দেওয়াই স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার কিন্তু বিবেকানন্দই বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আধ্যাত্মিক প্রবক্তা ও সন্ন্যাসী যিনি নিরাসক্ত কণ্ঠে সমাজের সমস্ত অন্যায় অবিচার ও জাতপাতের ভেদের জন্য ধর্ম ও শাস্ত্রকে দায়ী করেছেন। এ ছাড়া এক বিমূর্ত মানবিকতার জন্য তাঁর উদাসী সন্ন্যাসী হৃদয় মাঝে মাঝে উত্তাল হয়েছে। এ যেন এক সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস যা বেলাভূমিকে অতিক্রম করার আবেগ নিয়ে ছুটে আসে, কিন্তু বেলাভূমির পরিধি জানে না তাই চুরমার হয় আপন উচ্ছ্বাসে। অন্ধকার ও কুসংস্কারের পরিধি বেলাভূমির মত অনতিক্রমণীয়।

ভারতপ্রেমী মনীষী রম্যাঁ রলাঁ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,—'সব যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মরমী ভারতের ফ্রান্সিস আসিসি আমার প্রিয়তম মহর্ষি রামকৃষ্ণের দুঃসাহসী ঘোষণা আমার কানে বাজিতেছে। খালি পেটে ধর্ম হয় না।' মনের কাজও খালি পেটে হয় না। রামকৃষ্ণের শক্তিমান শিষ্য ভারতের সেন্টপল বিবেকানন্দের বিজয় পতাকায় লেখা ছিল বিষণ্ণ মহীয়সী বাণী—'দরিদ্র নারায়ণ'। তিনি বলতেন, 'যতদিন আমার দেশে একটি কুকুর ক্ষুধিত থাকিবে, ততদিন তাহাকে খাওয়ানোই হইবে আমার একমাত্র ধর্ম।' ('শিল্পীর নবজন্ম' ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২) বিবেকানন্দের এই বিষণ্ণ মহীয়সী বাণী 'দরিদ্র নারায়ণ' হল এদেশের জাতপাত লাঞ্ছিত মানুষের কথা। তাই বিবেকানন্দই বোধহয় প্রথম সন্ন্যাসী এদেশের দরিদ্র মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়ে উচ্চ শ্রেণীকে অভিযুক্ত করতে পেরেছেন, 'নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে

উঠতে বসতে জুতো লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন Professional (পেশাদার) ভিখিরি হয়েছে।' ভারতবর্ষের জাতিভেদের আর্থ আমাজিক কারণ সম্পর্কে অনেক মনীষী প্রায় জেগে ঘুমিয়েছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মনীষার কাছে সামাজিক কারচুপি ধরা পড়ে গেছে।

গান্ধীর 'হরিজন' ও বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণ' একই শোষিত শ্রেণীর মানুষ, কিন্তু বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়েও যা ধরতে পেরেছিলেন গান্ধী তা পারেননি, কারণটা বোধহয় রমঁ্যা রলাঁর উক্তির মধ্যে আছে,—'কিন্তু গান্ধী ও বিবেকানন্দের মধ্যে এই পার্থক্য চিরদিনের মতোই থাকিবে যে বিবেকানন্দ ছিলেন বিরাট মনীষী—আর মনীষা গান্ধীর সামান্য মাত্রও ছিল না' (বিবেকানন্দ, পৃ: ২৯৬)। জাতীয়তাবাদের জন্ম বিবেকানন্দের 'দরিদ্র নারায়ণে'র পর্ণকুটির নয়, জমিদার, বেনিয়া, দেশীয় সামন্তপ্রভুর বৈঠকখানায়।

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী ও অন্ধ ভারতপ্রেমিক তবুও তিনি স্বীকার করেছেন—'ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলানো, আর 'জাতি' 'জাতি' করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।' এই গরীবগুলোকে পিষে ফেলছে যারা তাদের শ্রেণীচরিত্র কী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন বিবেকানন্দ,—ঐ যারা চাষাভুষা তাঁতি জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য বিজাতি বিজিত স্বজাতি নিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমানকাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে তাদের পরিশ্রম ফলও তারা পাচ্ছে না।

'যাহাদের শারীরিক পরিশ্রম ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে 'সর্বকালে জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত?' তাদের বৃত্তান্ত জানাই হল ভারতের সমাজ ইতিহাসের দীর্ঘকালের জাতপাতের মুখোস পরানো শোষণ ব্যবস্থার কথা। ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামি তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেনি, কারণ বোধ হয় তাঁর মনীষা, যা রলঁ্যার মত প্রজ্ঞাবান পুরুষকে মুগ্ধ করেছিল। বিবেকানন্দই বলতে পারেন—'হিন্দুধর্মের ন্যায় আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবত্মা মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না। এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুৎ মার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। তোমরা তাদের ছোঁও না, "দূর দূর" কর। আমরা কি মানুষ?'—হিন্দুধর্মের এই বৈপরীত্যকে বিবেকানন্দ যেভাবে ধরতে পেরেছিলেন কোন জাতীয়তাবাদী নেতা সে যুগে

সেভাবে তা ধরতে পারেননি। তাই গান্ধীর 'হরিজন' ভারতের জাতপাতের লড়াইতে আজও জতুগৃহের বাসিন্দা।

গ্রাম ভারতের জাতপাতের চেহারা বিবেকানন্দের রচনায় স্পষ্ট দ্বার্থহীন ভাষায় প্রকাশ হয়েছে। কোন ছলচাতুরী নেই। নেই কোন মিথ্যা ধর্মাভিমান যা একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'আমাদের এই জন্মভূমিতে সাধারণ লোককে শত শতাব্দী যাবৎ এইরূপ মায়াচক্রে ফেলিয়া এমন হীনভাবাপন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের স্পর্শে অশুচি, তাহাদের সঙ্গে বসিলে অশুচি! তাহাদিগকে বলা হইতেছে, নৈরাশ্যের অন্ধকার তোদের জন্য—থাক চিরকাল এই নৈরাশ্যের অন্ধকারে।' ফল এই হইয়াছে যে, সাধারণ লোক ক্রমশ ডুবিতেছে, গভীর অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারে ডুবিতেছে, মনুষ্যজাতি যতদূর নিকৃষ্ট অবস্থায় পৌছিতে পারে, অবশেষে ততদূর পৌছিয়াছে'।

ধার্মিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যখন বলেন, 'ধর্মে জাতিভেদ নেই, কেবল সামাজিক ব্যবস্থা। Religion, therefore, is not to blame, but men. (সুতরাং জাতিভেদ ধর্মের কোন দোষ নেই, লোকেরই দোষ)' আমাদের তথাকথিত ধার্মিক হিন্দুরা এখন নীরব কারণ বিবেকানন্দ জাতি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আজও সমাজ মেনে নিতে পারেনি। হয়তো বা মেনে নিতে চায়নি। বিবেকানন্দ বলেছেন,—'জাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা, আমাদের বড় বড় আচার্যেরা উহা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সম্প্রদায়ই জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু যতই ঐরূপ প্রচার হইয়াছে, ততই জাতিভেদের নিগড় দৃঢ়তর হইয়াছে। জাতিভেদ রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র। উহা বংশপরম্পরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলির সমবায় (Trade Guild)' এক সাহসীর দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে সমাজের চরম সত্যটি ঘোষণা করা হল, অথচ এই সমাজে তার কোন প্রতিক্রিয়া হল না। কোন নতুন সমাজ বিপ্লবের দিকে বিবেকানন্দের চিন্তা মননের উত্তরসূরিরা মোড় নিলেন না। সৃষ্টি হল মিশন ও বিদ্যা বিপণন কেন্দ্র, আর তার গৃহীতা হলেন সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, যাদের বিবেকানন্দ দায়ী করেছেন এই সমাজব্যবস্থার জন্য। যাদের ক্ষমতা প্রতিপত্তির সৌধ দরিদ্রের দুঃখদৈন্যের উপরই নির্মিত।

ধনী ও সমাজের উচ্চবর্ণ সম্পর্কে বিবেকানন্দ কখনই মোহ ও দ্বিধা রাখেননি।

জাতপাতের এই সমাজব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা যে সর্বযুগে এক তাও যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য, আবার ঐতিহাসিক দিক থেকেও ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ যে একটি মৃতশক্তি তা বিবেকানন্দই প্রথম স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন। ভারতবর্ষে মার্কসবাদীয় চিন্তাচর্চার বহু আগেই বিবেকানন্দ বলেছেন,—

'তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ: তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বচ্ছরের মমি! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর, 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা।... ...হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত হয়েছে।...উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পারো দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নতুন ভারত বেরুক।'—এই 'চলমান শ্মশান'কে বিবেকানন্দ সারা ভারতবর্ষের বুকে দেখেছেন এক সমাজ নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে।

সামন্ততন্ত্রের এমন নির্মম ঘৃণ্য চিত্র কোন রাজনৈতিক নেতাও এভাবে আঁকতে পারেননি। ভারতের জাতপাতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সামন্ততন্ত্র কখনই পথ ছেড়ে দাঁড়ায়নি, এই 'চলমান শ্মশান' তার পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে যে সঞ্চিত রত্নপেটিকা আগলে আছে তা হল দেশের মূল সম্পদ। 'লুঠ করা ধন করে জড়ো তুই হতে চাস সবার বড়'—এই বড়র বড়াই হল জাত্যাভিমান।

উত্তরভারতের ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য যেমনভাবে বিবেকানন্দকে আলোড়িত করেছে, ঠিক তেমনভাবে তাঁকে দক্ষিণভারতের কঠোর জাতপাতের মুখোসের আড়ালে শোষণ করেছে সচেতন। তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, তবুও বলছেন, —'যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। ...দেখিবেন...আসুন...পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী...সিকিভাগ খ্রীস্টান হইয়া গিয়াছে। 'এই দেখ না—হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজ-অঞ্চলে হাজার হাজার পারিয়া ক্রশ্চান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে ক্রশ্চান হয়, আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে।' দক্ষিণ ভারত চিরদিন জাতপাতের যে নিষ্ঠুর শিকার হয়ে এসেছে, তার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজও সেই সময় থেকে ছড়িয়ে দেওয়া

হয়েছে সমাজ মৃত্তিকায়। কে এই বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী? বিবেকানন্দের বিশ্লেষণ,—'তাঙ্গী ও পারিয়াগণের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্য দায়ী কাহারা? কে ইহার জন্য দায়ী? তখন প্রত্যেক বারই আমি এর উত্তর পাইয়া থাকি যে, ইহার জন্য ইংরেজ দায়ী নয়, আমরাই আমাদের দুর্দশা অবনতি ও দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী—একমাত্র আমরাই দায়ী। হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' নামক মত দ্বারা সর্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।' ধর্মের আত্মাভিমানী যারা তারা কি কখনই এই প্রকার আত্মজিজ্ঞাসায় ভারতীয় সমাজে অধঃপতনের কারণকে বিশ্লেষণ করেছেন? এমন কী বিবেকানন্দের আদর্শের উত্তরসূরিরা তো আজ মঠ, মিশনের সম্প্রসারণ করে চলেছেন 'চলমান শ্মশান'দের সহায়তায়, 'চলমান শ্মশান'দের সেবায়। বিবেকানন্দের হাতের পতাকায় সেই বিষণ্ণ মহীয়সী বাণী 'দরিদ্র নারায়ণ', আজ তাঁর আদর্শের মঠ মিশনে বিবর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেছে।

বিবেকানন্দ আমাদের দেশের এক নিঃসঙ্গ ভারত পথিক, যিনি তাঁর বুকের পাঁজরে বজ্র জ্বালিয়ে দরিদ্র, জাতিভেদদীর্ণ শোষিত ভারতকে আবিষ্কার করেছেন। তাঁর কোন সহযাত্রী ছিল না, কোন উত্তরসূরি নেই।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বিশ্লেষণে হিন্দুসমাজে জাতপাত

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ আচার্য ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচয় শুধুমাত্র একজন মার্কসীয় চিন্তাবিদ্‌ই নয়, তিনি ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস গবেষণায় প্রবক্তা। আজ আমরা ভারতীয় সমাজের জটিল আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের সংশ্লেষের গ্রন্থিমোচন করতে তাঁর কাছেই পথ-নির্দেশ পেয়েছি। ভারতীয় সমাজের ভাববাদী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুধু এই কথাই আমাদের শেখাতে চেয়েছে যে ভারতে তপোবন সভ্যতা ছিল এক উচ্চ আদর্শের সমাজ, যেখানে শোষণ শাসন মুক্ত শার্দুল-মৃগের মিলন স্বর্গ। সকলের ছিল সমঅধিকার। সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার প্রাগৈতিহাসিক রূপ। এই সম্পর্কে এখনও অনেক গবেষক এই ধরণের মত পোষণ করেন :—'In the Brahmanic Period the vedic Aryans had reaehed a high state of Civilizatiou, They were Settled to a life of well Organised sociai order, their family life was Conducive to happiness and religious praetiees, they weve a Joyous people who always had a healthy out-look on life. They Considered to world to be a good place to liv and prayed to the god in order to attain a better life. In deed there was no tinge of Pessimism in the ont-took of vedic people, castc-system was established then, But thongh there was sort of gradation among people to the civic life of the nation, yet it had no bitter effect upon the inter-helation of people in the society (vedic Culture As Reflected in the SATAPATHA BRAHMANA,Sm Santi Bandyopadhay, Jonrnal of the Asiatic Society vol XXVII, NO 1 ।) কিন্তু মার্কসীয় দর্শনের আলোকে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ বোধ হয় প্রথম চিন্তাজীবী যিনি ভারতের সামাজিক ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন এবং একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন ,— 'সমস্ত ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।'— ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের আগে

অবশ্য ভারত ইতিহাস প্রসঙ্গে স্বয়ং কার্ল মার্কস-এর মন্তব্য ভারতের সাম্যবাদী সমাজ সম্পর্কে ভ্রান্তিবিলাস প্রমাণ করে। মার্কসের মতে 'The king is the sole and only proprietor of all the land.'। প্রাচীন আর্থ-সামাজিক ও জমির উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কের সঙ্গে ভারতের জাতি-সমস্যা প্রকারান্তে জাতপাত প্রথা উদ্ভব ও নিয়ন্ত্রণই হল ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের মৌল বিশ্লেষণ।

ভারতের শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসের মধ্যেই আছে ভারতীয় সমাজের জাতপাতের কারণগুলি। এই প্রসঙ্গে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ এক অন্ধকার ঐতিহাসিক গহবরে আলোকপাত করেছেন। এইখানে তাঁর মৌলিক চিন্তা ও ইতিহাস ব্যাখ্যার গুরুত্ব। তিনি অনেক ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেছেন এবং বিভ্রান্তি অপনোদন করতে সাহায্য করেছেন। The people of India ও The Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে লেখক স্যার হাবার্ট রিসলি জাতিভেদের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যে অবৈজ্ঞানিক ও ভিত্তিহীন অনৈতিহাসিক প্রমাণ করেছেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'কোন জাতির নাক ও মাথা যত চওড়া তার সামাজিক স্তর তত নিম্নে, যার নাক ও মাথা যথাক্রমে যত সরু ও লম্বা তার সামাজিক স্তর তত উঁচুতে'—রিজলির এই মতকে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব সংগৃহীত মাপ-জোক দিয়ে অপ্রমাণ করেছেন।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের মতে পূর্বে জাতি ছিল না, বর্ণ ছিল। ঋগ্বেদে মাত্র পুরুষ সূক্তে শূদ্র বর্ণের উল্লেখ আছে। শুক্লা যজুর্বেদে ও ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে শূদ্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের লোকেরা নিজেদের 'আর্য' ও শত্রুদের দাস, দস্যু ও অসুর বলতেন। তাঁর মতে আর্য শব্দ raee বাচক নয়, সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বত্র সংস্কৃতি বাচক। কৌটিল্যে—রাজনৈতিক অবস্থা বাচক, আর্য অর্থ স্বাধীন নাগরিক (free citizen)। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ চতুর্বর্ণের উদ্ভবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে যাস্কের নিরুক্তে কিকট বা মগধ দেশবাসী সম্বন্ধে 'অনার্য' কথা প্রথম ব্যবহৃত হয়। 'অনার্য' শব্দের ব্যবহারও raee অর্থে নয়। চতুর্বর্ণ বিভিন্ন স্বদেশী ও বিদেশী সমাজের লোক দ্বারা গঠিত হয়নি। চারিবর্ণ একই আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্তি ছিল। শূদ্র আর্য ছিল। বৈদিক যুগে সাধারণ জনগণের নাম ছিল বিশ এবং সমস্ত বিশকেই আর্য বলা হত। বৈশ্য মানে বিশের সন্তান। বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণেরই কাজ একপ্রকার ছিল। অনেক দিন পর্যন্ত সেজন্যে বৈদিক সাহিত্যে 'শূদ্রার্যৌ' কথাটি

পাওয়া যায়। তারা উভয়ই কৃষিকাজ, পশুপালন ও শিল্পকর্ম করত। রাজা হর্ষবর্ধনের সময় বৈশ্যরা কৃষি ও পশুপালন ছেড়ে বাণিজ্য আরম্ভ করে। সেই সময় থেকে শূদ্ররা একাই কৃষিকাজ ও পশুপালন করতে থাকে। শূদ্রেরা দাস বা ভূমিদাস ছিল না। যে কোন বর্ণের আর্য বর্ণাধিকার হারালেই শূদ্র বলে পরিগণিত হত। বর্ণ মানে বর্গ (class)। যদি বর্ণ মানে রঙ হয় তাহলে তা গাত্রবর্ণ নয়, বস্ত্রবর্ণ হতে পারে। পারস্য ও জার্মানিতে বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রবর্ণ ছিল। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের মতে আলঙ্কারিক অর্থেই বর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। ব্রাহ্মণদের কর্ম পবিত্র অতএব শ্বেত, শূদ্রের কর্ম মলিন, অতএব কৃষ্ণ।

বিশ থেকে ক্ষত্রিয় বা রাজন্য জাতির উদ্ভব হয়। রাজা একাধারে ছিলেন, বিচারপতি ও পুরোহিত। ব্রাহ্মণরা প্রথমে ছিলেন রাজকুলের ভাট বা কবি। তারা রাজার স্বগোত্র। কালক্রমে রাজার হাত থেকে পুরোহিতের কাজ ব্রাহ্মণরা ছিনিয়ে নেয়। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন যে বিনা সংগ্রামে তারা তা পাননি, বেদের বেণ রাজা, নহুস, রাজা পুরু প্রভৃতি উপাখ্যান শতরুদ্রিয়, ব্রাহ্মজায়া ও ব্রহ্মবাবা মন্ত্রে তার প্রমাণ আছে। কার্তবীর্যার্জুন ও পরশুরামের যুদ্ধের কাহিনীতে এই সংগ্রামের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। পুরোহিতের অধিকার প্রাপ্তি ছাড়া ক্ষত্রিয়ের কাছে অন্যসব বিষয়ে ব্রাহ্মণের হার হল, তাই ক্ষত্রিয় প্রথম বর্ণ হল। সম্ভবত বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণদের উপর মর্যাদার স্বীকৃত হয়েছে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ মনে করেন আরণ্যক ও উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ করে শিশুনাগ বংশের শাসনকাল পযন্ত ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের যুগ। পরবর্তী 'নন্দ' বংশও শূদ্র বংশ। ব্রাহ্মণ কৌটিল্যের সাহায্যে আর এক শূদ্র চন্দ্রগুপ্ত মগধে শূদ্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সম্রাট অশোক মৌর্য সাম্রাজ্যে শূদ্র ও ব্রাহ্মণের মধ্যে ব্যবহার সমতা ও দণ্ড সমতা প্রবর্তন করেন। মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গ বংশ স্থাপন করেন। ভারত ইতিহাসে এই প্রথম ব্রাহ্মণ বংশ রাজত্ব করতে আরম্ভ করল্। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে 'মনুসংহিতা'র শ্রেষ্ঠত্ব এই সময় থেকে সূচিত হয়। সুঙ্গ বংশের পর উত্তর ভারতে কণ্ব বংশ, অন্ধ্রবংশ ও বাকাবট বংশ এই তিন ব্রাহ্মণ রাজ বংশ রাজত্ব করে। মধ্যে উত্তর ভারতে ভারশিব ও গুপ্ত বংশ ব্রাহ্মণ না হয়েও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পরম পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতে শেষ হিন্দু রাজবংশ বিজয়নগর ব্রাহ্মণ না হয়েও গুপ্তদের

মত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন! ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের মতে এমন ভাবেই দীর্ঘকাল রাজত্বের ও রাজ সম্মান লাভের ফলে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রথম বর্গ (Class) ও ভূস্বামী হয়েছেন। মনুসংহিতার জন্য নয়।

ভারশিব, বাকাবট ও গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্বকালে নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম জন্মলাভ করে। ভারশিবরা শৈব ও গুপ্তরা বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন। কুষাণরা বৌদ্ধ ছিলেন, তাদের সময় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হওয়ায় ব্রাহ্মণ ধর্ম রূপ পরিবর্তন করে। বৈদিক যাগযজ্ঞ অর্থাৎ জীবহিংসা ছেড়ে, জাতি বৈষম্য শিথিল করা এবং সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে বৌদ্ধধর্মের এক প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়। এই সময়েই রামায়ণ ও মহাভারত বর্তমান রূপলাভ করে। রামায়ণ ও মহাভারতের দুই ক্ষত্রিয় বীর ভগবানের অবতার রূপে স্বীকৃত হল। বৈষ্ণব ধর্মের কৃপায় ও পুরাণাদির ভেতর দিয়ে আচার, বিচার, শুচি ও অশুচির উদ্ভব হয়।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ সামাজিক ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণের ঐতিহাসিকতা ও দ্বান্দ্বিক মূল্যায়নের ভেতর দিয়ে। তাই ভারতের সামাজিক ইতিহাসের শ্রেণী সংগ্রাম কখনই কোন ভাববাদী প্রশয় ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের লেখাতে স্থান পায়নি। হিন্দু সমাজে জাতপাতের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর মতে অনুলোম ও প্রতিলোম দুই প্রকার বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পরে বৌদ্ধ যুগে একই বর্ণের মধ্যে সামাজিক প্রয়োজনে কর্মের বিভাগ ও উপবিভাগ থেকে নানা সঙ্কর ও মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধযুগে দেখা যায় এক একটি পেশার লোকেরা এক একটি শ্রেণী (guild) গঠন করে। প্রথম craft guilds গুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পরে trade guilds উদ্ভূত হয়।

হর্ষবর্ধনের সময় Trade guilds গুলি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। শ্রেণীগুলির কার্য নির্বাহ, আইন প্রণয়ন ও বিচার এই তিনরকম ক্ষমতাই ছিল।

মুসলমান আমলেই এই শ্রেণীগুলো প্রস্তরীভূত হয়ে বর্তমান জাতিগুলিতে পরিবর্তিত হয়। আবার জাতিগুলি আদি নিবাস অনুযায়ী নানা উপজাতিতে বিভক্ত হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণদের মধ্যে উদিচ্য, সারস্বত, গৌড়, নাগর, রাঢ়ী, ও বারেন্দ্র ইত্যাদি। নাগভট্ট মতে মহারাষ্ট্রের ও রঘুনন্দন মতে বঙ্গদেশে বর্তমান কালে মাত্র দুটি বর্ণ আছে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। মধ্যদেশে ছত্রি

(ক্ষত্রিয়) ও বানিয়া (বৈশ্য) বর্ণও আছে। কোনো কোনো জাতির মধ্যে গোত্র চেতনা এবং কোনো কোনো জাতির মধ্যে দেশ-চেতনা প্রবল। একটি অন্যটির পরিপন্থী। যে সব জাতির মধ্যে গোত্র বন্ধন আছে যেমন রাজপুত জাতি, এরা দেশ হিসাবে উপজাতি গঠন করেননি। এছাড়া দেখা যায় একই জাতির মধ্যে যারা আর্থিক অবস্থায় উন্নত বেশি হয়েছে তারা অবশিষ্টদের থেকে নিজেদের পৃথক এক আভিজাত্য দাবি করেছে যেমন; গোয়ালা ও সদ্‌গোপ, ধোপা ও চাষা ধোপা, কৈবর্ত ও চাষী কৈবর্ত, তেলী ও কলু ইত্যাদি। আবার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যারা কৃষিকার্যের দ্বারা নিজের ভাগ্য ফিরিয়েছে তারা হয়েছে ভূস্বামী এবং রাজপুত বলে সামাজিক পরিচয় দিয়েছে। কোথাও কোথাও তারা রাজা পর্যন্ত হয়েছে। যেমন ছোটনাগপুরের নাগবংশীয় মহারাজ, পঞ্চকোটের গো বংশীয় রাজা ও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজরা। তাই দেখা যায় জাতি এক সামাজিক পদ বিশেষ। যারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারেনি একই অবস্থায় দারিদ্র্য দংশন সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে, তারাই অস্পৃশ্য, ভুঁইয়া বা ভূমিজই থেকে গেছে। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে জাতপাতের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের পশ্চাদ্‌পট উন্মোচিত হয়েছে। বাংলায় বল্লাল সেন মালাকার, কুম্ভকার, কর্মকার ও চাষী কৈবর্তদের আচরণীয় অর্থাৎ সৎশূদ্র পদে উন্নীত করেছেন। আবার সেই বল্লাল সেন সুবর্ণ বণিককে অনাচারণীয় অসৎশূদ্র জাতিতে নামিয়ে দিলেন। এই অসৎশূদ্র জাতির আবার পৌরোহিত্য করার জন্য বিশেষ একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে তাদের বলা হয় 'বর্ণ ব্রাহ্মণ'। শুধু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ নয় সৎশূদ্র পর্যন্ত এই 'বর্ণ ব্রাহ্মণ'দের ছোঁয়া খায় না। অথচ আসামে চিত্রল থেকে নেপাল পর্যন্ত পার্বত্য হিন্দুরাজ্যে উচ্চনীচ জাতির মধ্যে আহারাদি ও অনুলোম বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কারণ হিসাবে মনে হয় ব্রাহ্মণ প্রভাব সমানভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। যদিও অনেক প্রতিবাদী ধর্মসম্প্রদায় ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে, তবুও তারাই পরিণামে এক একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে নানা নতুন নিয়ম আচারের বন্ধন সৃষ্টি করেছে। বাঙালি বৈষ্ণব যাদের কোনো জাত্যাভিমান ছিল না। স্বয়ং নিমাই পণ্ডিত জাতপাতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু বাংলায় জাতিহীন বৈষ্ণবও একসময় 'জাতবোষ্টম' হয়ে গেল। অনেক অনাচারী অন্ত্যজ শোষিত মানুষ বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে তাদের অনুগ্রহ বা

কৃপালাভের আশায় গোব্রাহ্মণ সেবা ও ব্রাহ্মণানুমোদিত পথে আচার বিধি নিষেধ পালনে মেতে উঠল। তাই দেখা যায় পৈতা নিয়ে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় হবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ ভারতের সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণে এই কথাই প্রমাণিত করেন যে ভারতের জাতিসমস্যা সৃষ্টি হয়ে আর্থ-সামাজিক বনিয়াদে। তাই শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সংঘাতের মধ্যে দিয়ে সমাজে উৎপাদন শক্তিকে অধীকৃত করার ফলে এক এক সময় এক এক জাতি বা বর্গের (Class) প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করেছে। সমাজের শোষিত ও বঞ্চিত দরিদ্র মানুষ এই সংগ্রামে বার বার পরাজিত হয়েছে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ছল, বল ও কৌশলের কাছে। আজও সমগ্র উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার আবহমানের সামাজিক শোষণকে প্রচ্ছন্নভাবে অব্যহত রেখে আধুনিক যুগের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছে। সাম্প্রদায়িকতা, গোষ্ঠীপ্রাধান্য ও উগ্র হিন্দুয়ানির জাতপাতের আচার সর্বস্বতাকে আত্মরক্ষার দুর্গ পরিখার মত ব্যবহার করা হয়। আজ থেকে বহুদিন আগে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'Studies in Indian Social Polity' গ্রন্থে ইতিহাসের মোহমুক্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন মার্কসীয় চিন্তার আলোতে। কিন্তু সে আলো সম্পূর্ণভাবে অন্ধকারকে দূর করতে পারেনি। এখনও অনেক সংশয় ও অনেক সংস্কার পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অচলায়তনের প্রাচীন প্রহরীর মত।

বাংলার লোকধর্মে জাতপাতের প্রতিবাদ

বাংলার লোকধর্মের ইতিহাসে শুধু হিন্দু ধর্মের উচ্চবর্ণের শাসন ও জাতপাতের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ নেই, প্রতিবাদ আছে সমানভাবে মুসলমান ধর্মের উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধেও। মোল্লাতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্র একইভাবে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষকে শোষণ ও শাসনের নামে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের বিধিবিধান সৃষ্টি করেছে। শাস্ত্রকে দোহাই মেনে, আল্লা ও কৃষ্ণকে সামনে রেখে চলেছে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে উচ্চবর্ণের শোষণ। মার খাওয়া, ঘৃণিত মানুষরা ছোট ছোট ধর্মগোষ্ঠীতে বেদবাদ ও শরিয়তী বিধানকে অস্বীকার করে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের অনুশাসনের শৃঙ্খলও ছিন্ন করেছে।

সমাজের উচ্চবর্ণের ধর্ম ও দর্শনের প্রতিবাদী লোকধর্ম প্রাণের সম্পর্কে গড়ে তুলেছে এক একটি মানবধর্ম-গোষ্ঠী। এই ধর্মগোষ্ঠীতে নানা প্রকার দেহাত্মবাদী গুহ্য আচারও প্রচলিত হয়েছে। প্রান্তিক গ্রামগুলি থেকে এক একজন গুরু প্রায় উচ্চবর্ণের ধর্মের অবতারের মত অবতারত্ব লাভ করেছেন। বিশেষভাবে বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও সুফী সাধনার প্রভাব এইসব গৌণ লোকধর্মকে প্রভাবিত করেছে। মানুষের অন্তর্নিহিত পরম পুরুষের সন্ধান এইসব গৌণ লোকধর্মের সাধকরাই করেছেন। সেই সন্ধান-সাধনায় গানই হল এঁদের মর্মবাণী, অপরিমার্জিত, গ্রাম্য হাটে-মাঠে-নদী-প্রান্তরের লৌকিক ভাষায় এঁরা গান রচনা করেন। অনেক সময় চরম দারিদ্র্য ও সমাজের উচ্চবর্ণের ঘৃণা আর শোষণই হল এঁদের প্রেরণা। একজন ইংরেজ লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এ এল লয়েড ইংলণ্ডের লোকসঙ্গীত আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তা বোধহয় সব দেশের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'The mother of folklore is poverty'. সমাজের উচ্চবর্ণের সৃষ্ট জাতপাত ও দারিদ্র্য নিম্নবর্ণের মানুষকে অসহায় করে তোলে। সেই অসহায় নিঃস্ব মানুষের গুমরানো দুঃখ বেদনাই হল লোকসঙ্গীতের জননী। প্রতিকারহীন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে গান হয়ে কাঁদে। সে কান্নায় শুধু দেহতত্ত্ব ধর্মতত্ত্ব নেই,

আছে প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চবর্ণের জাত্যাভিমানের প্রতি বিদ্রূপ শ্লেষ। আমরা এবার সেইসকল গান ও লোকধর্মের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করব। অনেকে হয়ত বলতে পারেন 'জাতপাত' আলোচনায় লোকধর্ম প্রসঙ্গ কেন? উচ্চবর্ণের বিধিবিধান, বেদবাদ, মনুস্মৃতি, শরিয়ত সবই নিম্নবর্ণের মানুষকে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে কিন্তু বঞ্চিতরাও প্রতিবাদ করে, নিজেদের সংগঠিত করে এক প্রতিবাদী শক্তি সৃষ্টি করেছিল সেজন্যই এ প্রসঙ্গ অবশ্য আলোচ্য।

আমাদের বাংলাদেশে অসংখ্য গৌণ লোকধর্ম গড়ে উঠেছে। তারা কোরান, পুরাণ, বেদ ও স্মৃতি বিরোধী। এদের সম্পর্কে একসময় অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে আলোচনাও করেন। নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্নের লেখা 'বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়' গ্রন্থেও একটি তালিকা আছে। এই তালিকা অনুসারে লোকধর্মগুলি হল:

সাধ্বিনীপন্থী, খুশি বিশ্বাসী, রাধাশ্যামী, জগবন্ধু ভজনীয়া, রৈদাসী, সেনপন্থী, রামসনেহী, কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামভজা, রূপ কবিরাজী, রামবল্লভী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, রাধাবল্লভী, চরণদাসী, হরিশ্চন্দ্রী, মাধবী, চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, জগমোহিনী, গুরুদাসী বৈষ্ণব, রামপ্রসাদী, চামারবৈষ্ণব, হরিব্যাসী, নস্করী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী, দরিয়াদাসী, বুনিয়াদ দাসী, নরেশপন্থী, বেউড়দাসী, ফকিরদাসী, মুলুকদাসী।

বাউল ও সহজিয়া সম্প্রদায় হিসাবেই এঁরা পরিচিত। যদিও বাউলরা ঘৃণা করেন শাস্ত্র, কোরান, পুরোহিত ও মোল্লাতন্ত্রকে, সেইসঙ্গে মসজিদ মন্দিরও এঁদের মতে পরম প্রাপ্তির বাধাস্বরূপ। সহজিয়ারা বেদাচার, মূর্তিপূজা, ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করেন। এঁদের মতে গুরুই হল ভাবের মানুষ। বাউলরা অবতারবাদে বিশ্বাসী নন, কিন্তু সহজিয়া অবতারতত্ত্ব স্বীকার করেন। তবুও এতসব সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও এইসব লোকধর্মে জাত্যাভিমানী দুই সম্প্রদায়কে অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে আঘাত করা হয়েছে গানের মধ্যে দিয়ে। যদিও অধিকাংশ গানই দেহতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব এমন কী মাঝে মাঝে যৌন যোগাচারও সান্ধ্য ভাষায় বা প্রহেলিকাময় প্রতীকী দিয়ে বলা হয়েছে। দুদ্দু শাহের একটি পদে বক্রোক্তি ব্যক্ত হয়েছে উচ্চবর্ণের হিন্দুর প্রতি।

বলিহারি এক জাত এই ব্রাহ্মণ ভবে
ব্রহ্মত্বে খোঁজ নাহি দেখি ক্রিং ক্রিং দিয়ে ঠকায় সবে।

পার করেছে টিকি আর পৈতে

জাতের বড়াই করে খেতে আর শুতে

মুখের সেরা শুকনো ট্যারা সাধু কে আখ্যা দেবে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে :

মুসলমানে ভাবে আল্লাহ্ আমাদের দলে।

এমন বোকা দেখেছে কে কোন কালে॥

এ কথাটি পেলি না মুড়ো

চুল পেকে হলি রে বুড়ো খবর না নিলে।

এমনকী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রতিও দুদ্দু শাহের ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছে—

কি ধর্ম প্রচারে গোরা যারে প্রেমের ধর্ম কয়।

তবে কেন হরিদাসে 'হরিনাম' নিতে হয়॥

সবধর্মে আছে মুক্তি

বৈষ্ণবেরা বলে যুক্তি

তবে কেন এ রীতি হরিদাসের বেলায়॥

নিম্নবর্ণের মানুষদের রুটি রুজি পেশার সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্পৃশ্য অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন। নদীয়া, যশোহর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি জায়গায় তাঁতি বা জোলা সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্চবর্ণের যে মনোভাব তার প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের পদকর্তা কুবির গোসাই-এর গানে ; এই গানটির মধ্যে এক নির্মম সমাজচিত্রও আছে ;—

ভারি স্থতোর বাজার আককারা—

হয়েছে যুগী তাঁতি পুলিশ সৈন্য

শিখেছে কেয়াজ করা।

এখন কাপড় বোনায় লভ্য নেইক

উলটো দেনায় হয় সারা॥

কাপাস তুলো নেইক দেশে

কেশের কুলকোয় মাঠভরা

তাতে হয় না স্থতো অনাহত ভাবছে যত চাষীরা॥

এখন দায়ে পড়ে পৈতে ছিঁড়ে দণ্ডী হবে দ্বিজরা

এখন মাকু বেচে কাঁকু চুষে বেড়ায় সব জোলারা

কলার পেঠোর কপ্নি পরবে যত বাউল নেড়ারা॥

হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বিভেদে হানাহানিতেও এই লোকধর্মের সাধক কবিরা জাতপাতের ঊর্ধ্বে মানবতাকে বড করে দেখেছেন। যেমন লালন বলেছেন—

যবন কাফের ঘরে ঘরে
শুনে আমার নয়ন ঝরে
লালন বলে মারিস কারে
চিনলিনে মনের ধোঁকায় ॥

বাউল সহজিয়াদের কোন সমাজের নৈষ্ঠিক ধর্মধ্বজীরা সুনজরে দেখতে পারেননি। উচ্চকোটির সমাজের অনেক পণ্ডিত লোকধর্মকে অনাচারবাদী, বিকৃতরুচি ও কামসর্বস্ব বলে অভিহিত করতে দ্বিধা বোধ করেননি। নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা 'পাষণ্ড' নাম নিয়ে 'পাষণ্ডীদলন' জাতীয় বই লিখে তাদের আচারমার্গকে ধিক্কার পর্যন্ত দিয়েছেন। গোঁড়া মুসলমানরা শুধু পুঁথিগত প্রতিবোধই করেননি, জারি করেছিলেন 'বাউল ধ্বংস ফতোয়া'। শারীরিক নির্যাতন, কেশকর্তন কিছু বাকি রাখেননি তাঁরা। মনে হয় উচ্চবর্ণের এইসব নির্যাতন ও উপেক্ষাকে আড়াল করার জন্যই অনেকরকম ভাবে সহজিয়া ও বাউলরা হেঁয়ালির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সহজিয়াদের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কয়েকটি সম্পর্কে কিছু লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন সাহেবধনী সম্প্রদায় প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তাতে স্পষ্ট মনে হয় সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ এক পালটা জাতপাতহীন সমাজে এক নতুন সংহতি সৃষ্টি করেছিল। উচ্চবর্ণের প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবেও তার গুরুত্ব আছে। অক্ষয়কুমারের মতে—'ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না। কি হিন্দু কি মোসলমান সকল জাতিকেই স্বসম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করে। হিন্দুদিগকে 'ক্লীং দীননাথ দীনবন্ধু' এবং মোসলমানদিগকে 'দীনদয়াল দীনবন্ধু' এই মন্ত্রে উপদেশ দিয়া থাকে।' এছাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায় এদেশের উচ্চবর্ণের এক সময় চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল লোকায়ত জীবনে প্রভাব বিস্তারের জন্যে। উনিশ শতকের শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষ এই সহজ সত্য ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হওয়াতে নিষ্ঠাবান হিন্দু বিচলিত হয়েছিল। কর্তাভজার প্রভাব পড়েছিল কলকাতার ভক্তিমান সাধারণ ব্যবসায়ী ও নিম্নবর্ণের মানুষের উপর। কলকাতার তালতলা, হাটখোলা, বউবাজার, শাঁখারিটোলা, শোভাবাজার, বড়তলা প্রভৃতি এলাকার অনেক

আদিবাসিন্দা প্রায় বংশ পরম্পরায় দীক্ষিত কর্তাভজা।

সেকালের ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ লোকধর্ম কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রভাব সম্পর্কে এতই বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে 'জেলেপাড়ার সং'-এর মুখে সংলাপের ঢঙে গান বানিয়েছিল। পাত্র পাত্রী মহাশয় কর্তা মা ও ব্রাহ্মণ বুরাতি।

মহাশয়ের উক্তি

আমি মশাই এ দলের চাঁই সবাই মশাই বলে জানে।
ছাড়ে দেবতাগুরু আপন গুরু ও যার মন্ত্র ফুকি কানে॥
কলু তেলি বামুন মালী বদ্যি বা কায়েত হাড়ি চণ্ডাল সমেত।
আমার গুণের জোরে এক আসরে সবই জমায়েত॥

কর্তামায়ের উক্তি

বড্ড শুচি জাতে মুচি আমি কর্তা মা
ওগো আমি কর্তা মা।
আমার হলে দয়া যার বাঁজা জায়া
ছেলের শোনে রা
সেও ছেলের শোনে রা॥
পরে শাড়ি কড়ে রাঁড়ি যদি পেটটি উচু হয়
যদি কারও পেটটি উঁচু হয়।
আমার চরণ করলে শরণ তার নেইকো কিছু ভয়
ও তার নেইকো কিছু ভয়॥
ওই ঘোষপাড়ায় ডালিমতলায় আছে আমার মাটি
এই আঁচলে আছে আমার মাটি॥
রাখলে ঘরে (সতী) মায়ের বরে (আসে) ভাতার পরিপাটি
পায় ভাতার পরিপাটি॥

এই ঘোষপাড়ার কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে যত বিরূপ মনোভাব প্রকাশ হোক উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজে কিন্তু জানা যায় রাজা রামমোহন রায় ও ডাফ সাহেব ঘোষপাড়ায় এসেছিলেন। এ সম্পর্কে সুধীর চক্রবর্তী 'সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাদের গান' বইতে একটি চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন, '১৮০২ সালে উইলিয়ম কেরী ও মার্শম্যান দুলাল চাঁদের সঙ্গে দেখা করে আলাপ আলোচনা করেন। এমনকী শিকাগোয় অনুষ্ঠিত Religious Congress (১৮৯৩) অনুষ্ঠানে রামদুলালকে Advisory Council-এর সদস্য মনোনয়ন করা হয়। কর্তাভজাদের

বর্তমান দেবমহান্ত শ্রীসত্যশিব পাল আমাকে এই তথ্যসহ লিখিতভাবে জানিয়েছেন।'

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এদেশের পুরাতন ব্যধির মত সমাজজীবনকে পঙ্গু করেছে, দেশকে খণ্ডিত করেছে। বাংলার লোকধর্মে এদেশের সব থেকে বড় যে জাতপাতের বিরোধ তাকে প্রতিরোধ করতে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন সমন্বয় পথ। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের কুবির গোঁসাই হিন্দু মুসলমানের সেই সমন্বয়ের গানই শুনিয়েছেন—

আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার।
একহাতে বাজে না তালি এক সুরের কথা বলি
নীরে ক্ষীরে চলাচলি বীজের এই বিচার।
পিতা আল্লা মাতা আহ্লাদিনী মর্ম বোঝা হল ভার।

শুধু সাহেবধনী নয়, প্রায় সব কয়টি লোকধর্মে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ের কথা ও উচ্চবর্ণের শোষণ এবং জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে বেদনার্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ গান হয়ে ফুটে উঠেছে।

জাতিবর্ণে অবিশ্বাসী, বেদবাদ-বিরোধী এবং একান্তই মানবতাবাদী ও সমন্বয়-পথিক সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গীতিকার উচ্চবর্ণের ধোঁকায় কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে বেদনায় গেয়ে উঠেন—

সৃষ্টিকর্তা যে হোক বটে
নবদ্বীপে গৌররূপে সকল জাত ছেঁটে
করলেন একচেটে
সে এক মানলাম না।
তিনি হিন্দু মুসলমানের গুরু জেনেও
বিশ্বাস করলাম না॥
ভেক লয়ে বৈরাগী হলাম
মুড়িয়ে মাথা ছেঁড়া কাঁথা গলাতে নিলাম।
জাত খোয়ালাম
কিছুই হল না॥
যদি এক পিতা সকলের হত
একপথে একসাথে যেত
এক পাতে খেত এক নাম নিত
তাও তো নিলাম না॥

জাতপাতের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের সন্ত সাধক

(উত্তর ভারত)

সমাজের রাজা-রাজড়া, জমিদার, মহাজন, মোল্লা-পুরোহিত সকলের এককাট্টা হয়ে শাসন, শোষণই ইতিহাসের শেষ কথা নয়। অন্তত ভারতীয় সমাজে ক্ষমতাবান প্রভুরাই ইতিহাসের একমাত্র নায়ক নন। যদিও পরাধীন দেশে ইতিহাস একটা পাথুরে জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে লেখা হয়। ঐশ্বর্যের গুণকীর্তন করা হয়, সঙ্গে ঐশ্বর্যবান উচ্চবর্ণের মানুষই প্রাধান্য পায় বেশি। কিন্তু ইতিহাস পরিহাস-পরায়ণ, যদি না তার যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়। দেশের জীবন্ত লোকসমাজ, লোকধর্মকে উপেক্ষা করে যে ইতিহাস রচিত হয়, তার অ্যাকাডেমিক মূল্য যতই থাক, নতুন যুগের সমাজের কাছে সে প্রভাবহীন পুঁথিমাত্র।

ভারতীয় সমাজে হিন্দুধর্মে কেতাবী শাস্ত্রমানা সমাজের বাইরে যারা লৌকিক সমাজে বিশিষ্ট মানবধর্ম প্রচার করেছেন তাঁরা জীবন্ত লোকসমাজের লোকধর্মের নায়ক, ইতিহাসের চিরায়ত নিয়ামক জাতপাতহীন সমাজের প্রবর্তক এই সন্ত সাধকরা শাস্ত্রের ব্যাপারে অনেক উচ্চ আদর্শে মহান ছিলেন। তাঁদের মনীষা ও ঈশ্বরপ্রেমই অন্ত্যজ মানুষকে স্বমহিমায় স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যে এই মধ্যযুগীয় সন্ত সাধকদের অবদান কম নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে বর্ণ, শ্রেণী ও গোষ্ঠী বিভক্ত একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক ভারতীয় সমাজের ব্যাধির মর্মমূলে নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে! ভারতবর্ষে এইসব নিঃশব্দ বিপ্লবগুলো দেশের প্রান্তিক গ্রামে-গঞ্জে হয়েছে নিরক্ষর, নিঃস্ব, নিরাশ্রিতের আত্মিক প্রেরণায়। অনেক ক্ষেত্রেই এর কোন লেখাজোকা ইতিহাস নেই। নেই কোন সমাজবিপ্লবের তাত্ত্বিক কেতাব। কিন্তু কোনভাবেই ভারতের মত জটিল জাতপাত জর্জরিত সমাজে এই সন্ত সাধকদের নিঃশব্দ বিপ্লবকে ঐতিহাসিকভাবে অস্বীকার করা উচিত হবে না। ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে।

মধ্যযুগের বন্ধনহীন বা বে-শরা মতবাদের উৎসমুখ হয়ত এই সমাজের

ইতিহাসের মধ্যে আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, অথর্ববেদের ব্রাত্যরা অর্থাৎ বে-শরা হল সেকালের বাউল।

বাংলা নেপাল ও উত্তরপূর্ব ভারতে যে নাথপন্থ ও যোগিপন্থের সাধকরা ছিলেন তাঁরা উচ্চবর্ণের শাস্ত্র থেকে অনেক পরিমাণে মুক্তচিন্তার ও স্বাধীন ছিলেন।

মধ্যযুগের আলোচনায় প্রথম ও প্রধান লোকগুরু রামানন্দ। তিনি হিন্দু-ধর্মের জাতপাতের মূলে আঘাত করেছিলেন প্রেমভক্তি ধর্মের মধ্যে দিয়ে। আনুমানিক ১৪০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর সময়।

রামানুজ দাস হরিবর (১৮৫৭ খৃ,) তাঁর 'ভক্তমাল হরিভক্তি প্রবেশিকায়' লেখেন যে, রামানুজ যাঁদের উপদেশে প্রেমভক্তি পান তাঁরা ছিলেন বিষ্ণুচিত্ত ও ভক্ত শঠকোপ। শঠকোপ ও বিষ্ণুচিত্ত দুজনেই ছিলেন নিচজাতি। কিন্তু রামানুজ সম্প্রদায় খুব বেশি আচারসর্বস্ব ও জাতপাতের সংস্কারে আবদ্ধ। কিন্তু হরিবরের মতে রামানন্দ রামানুজ থেকে পঞ্চম শিষ্য। রামানন্দ প্রায় সারাভারত ঘুরে বেড়ান তাই নিয়ম রক্ষা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তার সম্প্রদায় তাকে ত্যাগ করে, যদিও সম্প্রদায়ে তাঁর স্থান খুবই উঁচুতে। হরিবর উল্লেখ করেছেন, 'রামানন্দ বুঝিলেন, ভগবানের শরণাগত হইয়া যে ভক্তির পথে আসিল তাহার পক্ষে বর্ণাশ্রম বন্ধন বৃথা, কাজেই ভগবদভক্ত খাওয়া দাওয়ায় কেন বাছাবাছি করিবে ঋষিদের নামেই যদি গোত্র পরিবার হইয়া থাকে তবে ঋষিদেরও পূজিত পরমেশ্বর ভগবানের নামে কেন সবার পরিচয় হইবে না? সেই হিসাবে সবাই তো ভাই এক জাতি। ভক্তিদ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব, জন্ম দ্বারা নহে।' (ভক্তমাল হরিভক্তি প্রবেশিকা, পৃঃ ৮১-৮২)

রামানন্দ প্রেম ভক্তির সহজ পথে সমাজের উচ্চবর্ণের শাস্ত্রমানা আচারসর্বস্ব ধর্মের কৃত্রিমতাকে ত্যাগ করে, জাতি ও বর্ণনির্বিশেষে ধর্ম উপদেশ দিয়েছেন। তাই সংস্কৃতস্ত ভাষাকে বর্জন করেছেন। হিন্দিতেই তাঁর বাণী প্রচার করেন। রামানন্দের প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের অনেকেই সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ—

১। রবিদাস চামার। ২। কবীর জোলা মুসলমান ৩। ধন্না জাঠ ৪। সেনা নাপিত ৫। পীপা রাজপুত ৬। ভবানন্দ ৭। সুখানন্দ ৮। আশানন্দ ৯। সুরসুরানন্দ ১০। পরমানন্দ ১১। মহানন্দ ১২। শ্রীআনন্দ।

শেষের দিকে এই ভক্তরা রামানন্দের সঙ্গে রামানুজ সম্প্রদায় থেকে চলে আসেন। এছাড়াও রামানন্দের অনেক নিচ জাতির মানুষ শিষ্য ছিলেন। তাঁর

অনেক নারীভক্তও ছিলেন। বেদের শূদ্র ও নারীকে রামানন্দ আত্মস্বরূপের স্বীকৃতি দিয়ে আধ্যাত্মিক অধিকার দান করেন। যদিও রামানন্দী সম্প্রদায় সম্পর্কে আজও অনেক বৈদেশিক সমালোচকের ভ্রান্ত ধারণা আছে। এ প্রসঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মন্তব্য করেছেন, 'অনেক বৈদেশিক সমালোচক তাঁর এসব বাণী দেখিলেও মানিতে চান না যে, তিনি মূর্তিপূজা ও জাতি-ভেদের প্রতি আস্থা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁরা বলেন, এখনকার রামানন্দ সম্প্রদায়ে তো এসব আছে। যুক্তি যদি এমন হয় তবে দয়ার অবতার ভগবান যীশুকেও বলিতে হয় তিনি দয়া ও অহিংসার অবতার ছিলেন না—তিনি সাম্রাজ্যবাদের উপদেষ্টা ও অস্ত্রশস্ত্র পরায়ণ হিংসা ও যুদ্ধের গুরু ছিলেন। আজিকার অবস্থা দেখিয়া তখনকার আদর্শের বিচার করা চলে না।' রামানন্দের মত সম্প্রদায় নির্বিশেষকে জাতপাতহীন এক সমাজের সন্ধান দিয়েছিল।

রামানন্দের সম্প্রদায়ের বাইরে তাঁর ভক্তিপ্রেমের অনুপ্রেরণায় ভক্তিপ্রেমের সাধক সদনভক্ত ও নামদেবের নাম করতে হয়। যাঁরা নিচকুলে জন্মগ্রহণ করেও ভক্তিধর্মে দ্বিজোত্তম ছিলেন। সদনভক্ত ছিলেন জাতিতে কসাই। তাঁর মাংস বিক্রির দাঁড়িপাল্লায় লাগানো ছিল একটা শালগ্রাম শিলা। শালগ্রামের এই দুর্গতি দেখে এক সাধু তা নিয়ে যান। রাত্রে সাধু স্বপ্ন দেখলেন যে শালগ্রামের দেবতা বলছেন, 'আমাকে সদনের বাড়িতে রেখে এসো, আমি তার সহজ প্রেমভক্তিতে মুগ্ধ। এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে।'—কাহিনীটি ভক্তমালে আছে। কাম ক্রোধ জয় করে সদনজী দেহদুঃখ সহ্য করে ধর্মজীবনে অগ্রসর হন। পরিশেষে জগন্নাথদেব তাঁকে আপন স্থানে ডেকে নেন।

নামদেব ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক দরজি বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামানন্দর মত দক্ষিণ ভারত থেকে ইনিও ভক্তিধর্ম উত্তর ভারতে নিয়ে আসেন। পাঞ্জাবের বটালার কাছে ঘোমান গ্রামে তিনি বাস করতেন।

মারবাড়ে ধুনিয়া বা তুলাধুনকরের বংশে আরেক নামদেব জন্ম গ্রহণ করেন।

রবিদাসের জন্ম কাশীর এক মুচির (চামার) পরিবারে। 'ভক্তমাল হরিভক্তি প্রবেশিকা' মতে রবিদাস জুতো সেলাই করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। রামানন্দের কৃপায় নতুন পথের সন্ধান পেয়েও তিনি তাঁর জাতব্যবসা ত্যাগ করেননি। কথিত আছে এক সাধু তাঁকে পরশপাথর দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু রবিদাস তা গ্রহণ করেননি। তিনি স্ববৃত্তিকে যথেষ্ট সম্মানের মনে করে সহজ

সরল জীবনকেই সত্য বলে চিনতে পেরেছিলেন। রবিদাস ভারতের ঘৃণ্য অন্ত্যজ সমাজের প্রতিনিধি শুধু নন, সর্বকালের লোকগুরু, আদর্শ স্থানীয়।

রবিদাস ভগবানের নামগানের জন্যে কোন মতে একটি মঠ তৈরি করেন। ব্রাহ্মণরা রাজার কাছে নালিশ করেন তাঁর বিরুদ্ধে, মুচি হয়ে এ সকলের জাত নষ্ট করছে। রাজা তাঁকে ডেকে পাঠালেন, তিরস্কারের জন্য, কিন্তু রবিদাসের দৃঢ়আত্মপ্রত্যয় ও প্রেমোজ্জ্বল মুখ দেখে নাকি কিছু বলতে পারেননি। এছাড়া রবিদাস (চামার) সম্পর্কে আরও অলৌকিক কাহিনী কথিত আছে, যে রানী ঝালী গুরু রবিদাসকে একবার যজ্ঞ উপলক্ষে আনিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এই যজ্ঞে কেউ রান্না করা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেননি। তাঁরা স্বপাকে যখন খেতে বসেছিলেন তখন দেখেন প্রতি দুইজনের মধ্যে রবিদাস খেতে বসেছেন।

রবিদাস নামে ভারতের সর্বত্র মুচিরা নিজেদের রুইদাসী বলে আত্মপরিচয়ে গৌরববোধ করে। এইভাবে হীন অন্ত্যজ সমাজকে আত্মমর্যাদার অধিকার দান করেছিলেন একজন অন্ত্যজ সাধক। কঠোর ব্রাহ্মণ্য অনুশাসন অমান্য করেও।

সেনা ভক্ত ছিলেন জাতিতে নাপিত। রামানন্দের কৃপায় তিনি নবজীবন লাভ করেন। ভক্তজীবন লাভ করেও তিনি তাঁর স্ববৃত্তি ক্ষৌরকর্ম ত্যাগ করেননি। রাজা সেনার ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষিত হন। সেনা ছিলেন বাঁধু নগরের অধিবাসী। সেখানে রাজবংশীদের দীক্ষাদানের একমাত্র অধিকার নাকি সেনার বংশধরদের।

এছাড়া ভবানন্দ ছিলেন পণ্ডিতভক্ত। গুরু রামানন্দের আদেশে তিনি বেদান্তশাস্ত্র সহজবোধ্য ভাষায় হিন্দিতে লেখেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'অমৃতধার'। জাতপাতের ভেদ মুছে সাধারণের জন্যে বেদান্তের বাণী সহজবোধ্য করা ও সংস্কৃত ভাষার আভিজাত্যের বাইরে লোকভাষা ব্যবহার এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

ধন্না ছিলেন জাতিতে জাঠ। ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁর জন্ম। বাল্যকালে তিনি এক ব্রাহ্মণের কাছে কিছু উপদেশ পান। সে সময় থেকে তিনি মনে মনে যা ভোগ করতেন তা একত্রে ভগবানের সঙ্গে ভোগ করতেন। এর বেশি কিছু জ্ঞান ব্রাহ্মণের কাছে প্রার্থনা করলে তাঁকে রামানন্দের কাছে কাশীতে যেতে বলেন। রামানন্দ ধন্নার অনুরাগ দেখে নিচ জাতি হওয়া সত্ত্বেও শিষ্যত্ব গ্রহণে অস্বীকার করেননি। জাঠেরা কৃষক। তাই জাতপাতের বিচারে তাঁর কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকার নেই। সকলে উপহাস করে

যখন তাঁকে বলত, 'ধন্না ভক্ত হয়ে তোর কী লাভ ?—এর থেকে চাষবাস করলে তুই একগুণ বীজে দশগুণ শস্য পেতিস।' ধন্নার আত্মপ্রত্যয়ী উত্তর ছিল, 'যে ক্ষেত্রে আমি এখন যাকে সেবা করছি তাতে আমি সহস্রগুণ পাচ্ছি।'—ধন্নার রচিত কিছু ভজন গ্রন্থ সাহেবে আছে।

কবীরের জন্ম সময় নিয়ে পণ্ডিতদের নানা মতভেদ আছে। তিনি নাকি ১২০ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাশীতে ১৩৯৮ সালে তাঁর জন্ম। কিন্তু হাণ্টার (Hunter)—এর মতে ১৩০০—১৪২০ পর্যন্ত কবীরের সময়। কবীর ভারতীয় লোকজীবন শুধু নয় উচ্চকোটির সমাজ জীবনেও এক জাতপাতহীন মুক্ত মনন ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন। তাঁর দোঁহার নির্মল সত্য সংবেদনশীল মানুষকে স্পর্শ করেছে। রামকৃষ্ণের কথামৃতের মত রমণীয় সরসতা ও সরলতায় কবীরের দোঁহা সমাজসত্য, মানবসত্য ও ধর্মীয় গোঁড়ামির মুখোশ খুলে দিয়েছে। তিনি প্রথম ভারতীয় সাধক যিনি হিন্দু মুসলমান দুই বিবাদমান সম্প্রদায়কে এক অভিন্ন মিলন সূত্রে বেঁধেছিলেন। কবীর মুসলমান জোলার পুত্র। হিন্দু লেখকরা এই কথাটি গোপন করতে চেষ্টা করেছেন। ভক্তমাল ও তার টীকাকারের মতে মুসলমানের ঘরে পালিত হলেও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের সন্তান, এ এক ভারতীয় সামাজিক ব্যাধি, জাতিবিচারে ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ না হলে তাঁর মনাষী অস্বীকার করার প্রবণতা। তাঁর ভক্তরা বিশ্বাস করেন তিনি সত্য নিরঞ্জন পুরুষ, তাঁর আবার জন্ম কী ? তিনি লীলা করতে কাশীর কাছেই লহরতালাও সরোবরে কমলে শুয়ে ছিলেন। জোলা নীরু ও স্ত্রী নীমা তাঁর পিতামাতা রূপে তাঁকে পালন করেন মাত্র।

কবীর এদেশে শাস্ত্র আচারের সব থেকে বড় হাতিয়ার সংস্কৃত ভাষাকে ত্যাগ করে চলতি হিন্দি ভাষাতেই তাঁর উপদেশ দেন। কবীর মনে করতেন —'সংস্কৃত কূপ জল কবীরা ভাষা বহতা নীর।' কবীরের জীবনে নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্যেও সহজ মানবসত্য প্রকাশিত হয়েছে। তিনি হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের অর্থহীন বাহ্য আচারকে গ্রহণ করেননি। মিথ্যা আচারকে আঘাত করার দুঃসাহসিক ক্ষমতাও ছিল তাঁর। কথিত আছে, তাঁর গুরু রামানন্দের শ্রাদ্ধে অন্য সব শিষ্যরা কবীরের কাছে দুধ চাইতে আসলে, তিনি মরা গরুর অস্থি-পঞ্জরের কাছে এসে দুধ চান। অন্য শিষ্যরা ক্ষুব্ধ হলে তিনি বলেন, মরা মানুষের খাদ্য হিসাবে মরা গরুর দুধই ভাল।

কবীরও ব্যক্তিজীবনে কাপড় বুনে বাজারে বিক্রি করতেন। এতে তাঁর

কখন নিজেকে ছোট জাত বলে মনে হয়নি। সাধনার অর্থে কখনই তিনি শ্রমবিমুখতা বুঝতেন না।

তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য অনেক দোঁহার মধ্যে তাঁর বাণীকে প্রচার করেছেন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতে সব থেকে বড় জাতপাতের লড়াই হল এই দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। ভক্তদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের অভিযোগে শিকন্দর শাহ লোদী কবীরকে ডেকে পাঠান। অভিযোগকারীরা একই কাটরায় একত্রিত হয়েছেন। কবীর উভয় দলকে একত্র দেখে উচ্চহাস্য করে বলেন, 'ঠিক হয়েছে, তবে ঠিকানাটা একটু ভুল হয়েছে।' বাদশা বিরক্ত হয়ে জিগ্যেস করেন, 'কী ব্যাপার?' কবীর বলেন, 'হিন্দু মুসলমানকে মিলানোই আমার লক্ষ্য ছিল। সবাই বলত তা নাকি অসম্ভব। আজ তা সম্ভব দেখলাম। তোমার মত দেশের রাজার সিংহাসনতলায় যদি তা সম্ভব হয়, তবে বিশ্বের অধিপতির সিংহাসনতলে তা সম্ভব নয় কেন?—সে জায়গাটা কী এর থেকে প্রশস্ত নয়—?'

লোকগুরুর জীবনসত্য নানা অলৌকিক ঘটনায় আবৃত থাকলেও তাঁর প্রভাব সমাজ জীবনের অন্ত্যজ শ্রেণীকে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ও আত্মোপলব্ধি অধিকার দিয়েছে। তাই কবীরের প্রভাবে আরও কয়েকটি লোক-ধর্মের উদ্ভব হয় যাঁরা শাস্ত্র, জাতিভেদ মানেন না। এঁরা হলেন, জগজীবনের সৎনামী সম্প্রদায়, গাজীপুরের শিবনারায়ণী সম্প্রদায়, চরণদাসী, পলটু সাহেবী, মলুকদাসী, প্রাণনাথী, দরিয়াসাহেবী প্রভৃতি সম্প্রদায়।

তবে পণ্ডিতরা মনে করেন কবীরের মতবাদ প্রচারের আগে বাংলা ও ওড়িশায় নাথপন্থ ও নিরঞ্জনপন্থের প্রচার ছিল। পরে ওড়িশায় মহিমাপন্থ ও কুম্ভীপটিয়া মতবাদ প্রবর্তিত হয়। ওড়িশায় এই কুম্ভীপটিয়া মত মুকুন্দদেব কর্তৃক স্থাপিত। এরা মূর্তি, মন্দির ও ব্রাহ্মণের শাসনবিরোধী। জাতিবিশেষের শ্রেষ্ঠতা এঁরা স্বীকার করেন না। এঁরা একবার জগন্নাথদেবের মন্দির ভাঙতে গিয়েছিলেন। ওড়িশায় অনন্তকুলীয়া যে কোন জাতির কন্যা বিবাহ করেন ও সকল জাতির সঙ্গে পংক্তিভোজন করেন। ওড়িশায় বিন্দুধারীদের মধ্যে যে কোন জাতের শিষ্য হওয়া যায়। গুরু জ্ঞানী হলেই হল।

ভারতবর্ষের বেদাবাদ ও লোকধর্মের সঙ্গে এদেশের জাতপাতের সামাজিক ইতিহাস জড়িত, তাই তাকে বাদ দিয়ে জাতপাতের প্রবর্তনা ও বিরুদ্ধবাদী আন্দোলনের অনুসন্ধান কখনই সম্ভব নয়। ধর্ম ও জাতপাত জন্মসূত্রে সহোদর।

ভারতের ভক্তিধর্মে জাতপাতের প্রতিবাদ

কবীর, দাদু, সুরদাস ও রজ্জব এঁরা সকলেই সমাজের মর্মমূলে এক চিরন্তন মানব সত্য পৌঁছে দিয়েছেন। তা ধর্মীয় বাণী হলেও সমাজের ওপর তলার শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের পথ। ভারতে নিম্নবর্ণের মানুষকে পতিত করে রাখার জন্য ধর্ম ও শাস্ত্রকে প্রায় প্রহরীর মত দাঁড় করিয়ে রেখে উচ্চবর্ণের মানুষ নিজেদের স্বাথ সংরক্ষণ করেছে। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণ্যসমাজ দান পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির মাধ্যমে সব রকমভাবেই নিচের তলার মানুষকে শোষণ করেছেন। ভারতে ভাগবত ধর্মী, বিষ্ণু-উপাসক বৈষ্ণবরাই প্রথম হিন্দু সমাজের জাতপাতমুক্ত মানবতার বাতাবরণ তৈরি করেন। পরে ভারতের বিশেষ কয়েকটি লোকধর্মে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। বৈষ্ণব ধর্ম পরে নানা জটিল তত্ত্ব ও পাণ্ডিত্যের নৈষ্ঠিকঅরণ্যে পথ ভুল করে। ভারতের লোকধর্মের সাধকরা কিন্তু মানুষকে পৌঁছে দিয়েছে এক লোকায়ত আধ্যাত্মিক সমাজে। যেখানে উপবীত অপেক্ষা ভক্তিউপাসনা অনেক বেশী মূল্যবান। গ্রন্থের গ্রন্থিমুক্ত সত্য এক মানবসমাজ, যে সমাজ আজ অনেক দেশে অনধিকৃত।

সমস্ত লোকগুরু পরোক্ষভাবে ভারতের জাতপাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামী সাধক। আধ্যাত্মিক জীবনের বোধির সঙ্গে সঙ্গে অর্জন করেছেন সামাজিক ও মানবিক অধিকার। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে তাঁরা চিরকালের 'অচ্ছুৎ', —চিরদিনের উপেক্ষণীয় মহাপুরুষ। ভারতে উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবী মহলে রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সেনই বোধহয় এ দেশের লোকগুরুদের সম্পর্কে প্রথম সশ্রদ্ধ প্রশংসায় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ রজ্জবের প্রার্থনা ও বাণী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'জগতের কোন সাহিত্যে এমন গভীর ও মধুর প্রার্থনা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না'। এ ছাড়াও বাংলায় লালন, উত্তরভারতের কবীর প্রমুখ লোকগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ ছিলেন। এঁদের সম্পর্কে জাত্যাভিমানী হিন্দুসমাজ কোনদিন তেমন আকর্ষণ বোধ করেনি। অথচ ভারতের বিচিত্র জাতপাতে বিভক্ত

সমাজে এঁরা ব্রাত্যের অসিধারাব্রত পালন করে গেছেন অন্ত্যজ, হীন, অস্পৃশ্য সমাজের ভেতর থেকে। তাই দেখা যায় শুধু জাতপাত নয় প্রায় সব বর্ণহিন্দুর সংস্কার এঁরা অস্বীকার করেছেন। ভারতের ধর্মবিপ্লবে এঁরাই অগ্রণী। ব্রাহ্ম বা আর্যসমাজ ছিল 'এলিট' বা 'রক্ষণশীল' প্রাগ্রসরদের আন্দোলন। ভক্তিধর্মের এক নতুন মানব মূল্যবোধের প্রবক্তাও এঁরা। মধ্যযুগের সন্তসাধকদের মধ্যে এক প্রবচন প্রচলিত ছিল।

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রবাট কিয়ো কবীরনে সপ্তদ্বীপ নৌখণ্ড॥

ভক্তি উপজিল দ্রাবিড় দেশে, এ দেশে আনিলেন রামানন্দ কবীর তাহা সপ্তদ্বীপ নবখণ্ড পৃথিবীতে প্রকাশ করিলেন।

এই ভক্তিধর্মের উন্মেষে ভারতের জাতপাতের এক অভিনব উপায়ে বন্ধনমুক্তি ঘটে। এক নতুন বর্ণব্যবস্থাহীন সমাজ সৃষ্টি হয়, সমাজের শ্রমজীবী মানুষেরাই হন সেই সমাজের স্রষ্টা। ভারতের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে Romila Thapar তাঁর Ancient Indian Social History গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন,—'An equally obvious case is that of certain sections of the bhakti teachers such as the Alvars and Nayanars of Tamil Nadu. They frequently belonged to urban and artisan groups who objected to both brahmanical rituals and the iniquities of caste ranking. The creation of new religious groups disowning identification with any caste or adherence to caste rules producсd a temporary sense of mobility…' এই ভক্তিধর্ম ভারতের সামাজিক অচলায়তনে এক প্রবল আঘাত হানলেও, বৈষ্ণব ধর্মের উদার সমর্থন ও সহায়তায় এর সম্প্রসারণ হয়।

দক্ষিণ ভারতের দ্বাদশ আলবারের নয় জন অন্তত মানুষ এবং তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু নীচকুলজাত এবং 'আণ্ডাল' একজন নারী। এছাড়া পঞ্চম আলবার অন্ত্যজ শ্মশানচারী ডোমজাতীয় শঠকোপের 'তিরুবায়মোলি' বা মুখের বাণী বেদের থেকেও বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে সমাদৃত। আণ্ডাল ও তাঁর পিতা বিষ্ণুচিত্ত আলবার জাতিতে অস্পৃশ্য পারিয়া শ্রেণীর ছিলেন।

উচ্চবর্ণের আচারসর্বস্ব ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ভক্তিপ্রেম ধর্মের প্রবক্তা দক্ষিণ ভারতের আলবারেরা। নাথমুনি, আলবন্দার-যামুনাচার্য, অর্থপঞ্চককার পিল্লে

লোকাচার্য (১২১৩ খৃঃ) প্রমুখের সময় থেকে রামানুজের সময় পর্যন্ত এই নবভক্তিধর্মের উত্তম অপ্রতিহত ছিল। নাথমুনি, যামুনাচার্য প্রমুখ আচার্যরা জ্ঞানের দিক থেকেও এই ভক্তিধর্মকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। জাতপাতের কঠিন নিয়ম শাসিত দক্ষিণ ভারতে দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ বিষ্ণুভক্তি বিতরণ করে সমাজের অনেক নীচ, অস্পৃশ্য জাতিকে সমাজে উঁচুতে টেনে তোলেন। ধর্মের দৃষ্টিতে বিষ্ণুভক্ত সবাই সমান, অথচ জাতিভেদ বর্তমান, তাই প্রায় দু'কূল রক্ষার জন্যে তারা পঙক্তিভোজনে মত দিলেন না। এ ব্যবস্থাকে বলে তেন্ কলই বা দক্ষিণবাদ।

এই 'তেন্ কলই বাদ'-তে ধর্মবিষয়ে বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করা হচ্ছে মনে করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বেদান্ত-দেশিক আবার পুনঃপ্রবর্তন করেন বেদবাদ ও প্রাচীন রীতিনীতি। এ বেদবাদকে বলে 'বেদ-কলই'। 'তেন্ কলই'রা বিয়েতে বৈদিক মন্ত্র ও হোম বাদ দিয়েছিলেন, বিধবাদের মস্তক মুণ্ডন প্রভৃতি পরিহার করেন, সেগুলি 'বেদ-কলই'রা পুনঃপ্রবর্তিত করেন।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও শাস্ত্রীয় বিধান সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করতে পারেননি ভক্তিধর্মের প্রথম দিকের লোকগুরুরা, তার কারণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রক্তমজ্জায় গড়া ভাগবতপন্থীরা এই ভক্তিধর্মের প্রেরণাদাতা। এছাড়াও ছিল হিন্দুসংস্কৃতির এক আগ্রাসী প্রভাব—Romila Thapar-এর মতে. "It was soon incorporated into the 'Great Tradition' of Hinduism, as happened with the Tamil devotional cult during Pallava period and with certain aspects of the tantric cult.' (Ancient Indian Social History. P-116) লক্ষ্মীর উপদিষ্ট বলে 'রামানুজ' মতকে শ্রী সম্প্রদায় বলা হয়। এছাড়া বিষ্ণুস্বামীর সম্প্রদায়কে রুদ্র সম্প্রদায় বলে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। শিব বা রুদ্র ভাবিত বৈষ্ণব মতই তিনি প্রচার করেন। বল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গ ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দস্বরূপে উপাসনা করে। শ্রী সম্প্রদায় প্রভৃতি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের বড় বড় আচার্যরা তাঁদের আদি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন আলবার প্রভৃতি নিরক্ষর জাতকুলহীন অস্পৃশ্য সমাজের সাধকদের কাছ থেকে। এখানেই একটা কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে ভক্তিধর্মে ভারতের উচ্চ নীচ দুই বর্ণের মানবতাবাদী মানুষের অবদান আছে। অন্ত্যজ-মানুষও সমাজে উচ্চ চিন্তার ও মানব আদর্শের জন্ম দিতে পারে।

চৈতন্যদেবের মতকে গৌড়ীয় মাধ্বমত বলে। মাধ্বমতের এক স্রোত

বাংলায় মহাপ্রভুকে ভক্তিপ্রেমধর্মে মাতালেও তাঁর পূর্বেও বাংলায় ঈশ্বরপুরী ও কেশবভারতী ছিলেন ভাগবতপন্থী বৈষ্ণব। ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের এক পরোক্ষ প্রভাব আছে সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে অন্ত্যজ মানুষ যে অধিকার হারিয়ে ছিল, সে মানবাধিকার ফিরে পাবার সংগ্রামে ভাগবতপন্থী বৈষ্ণবদের এক উদার অনুপ্রেরণা ছিল। অনেকক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে উচ্চবর্ণের বৈষ্ণবরা জাতপাতের লড়াইতে অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন বাংলায় নিমাই পণ্ডিত, নিত্যানন্দ, তেমন আসামের শংকরদেব।

আসামের শংকরদেবের মহাপুরুষিয়া মত আরও একটু উদার। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তিনি নাগা, মিকির ও মুসলমান শিষ্যকে দীক্ষা দিয়েছেন। দেবদেবী পূজা, মন্দিরে যাওয়া, প্রসাদ খাওয়া তাঁর মতে মিথ্যাচার। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সব থেকে জাতপাতের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রতিবাদ হল শূদ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য।

ভারতের ধর্ম ইতিহাসে ভক্তিধর্মের উন্মেষ সম্পর্কে যে সত্যটি উদ্ধার করা যায় তা হল মুসলমান সাধনা ও মুসলমান শক্তির আবির্ভাবে ভক্তি ও প্রেম ধর্ম উদ্বেল হয়। নানা প্রকার সামাজিক অন্ধতা ও কুসংস্কার ধর্মের আচার-সর্বস্ব জটিলতায় চাপা পড়া ভক্তিধর্ম এক প্রতিবাদী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম সাধনার একেশ্বরবাদ ও দৃঢ় নিষ্ঠার অনুপ্রেরণায় ভক্তিধর্ম জাগ্রত হয়। কারণ ভক্তিবাদ এদেশে নতুন কোন ব্যাপার নয়। বেদে বশিষ্ঠাদির মন্ত্রে বরুণ প্রভৃতি দেবতার স্তবে ভক্তির ভাব দেখা যায়। তবে পণ্ডিতরা মনে করেন আর্যরা একদিকে ভক্তি অপেক্ষা যাগযজ্ঞ ক্রিয়াতেই ও অন্যদিকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভে বেশি অনুরক্ত ছিলেন। আর্যদের পূর্ববর্তী দ্রাবিড় জাতির মধ্যেই ছিল ভক্তিভাব বেশি। আর্যদের জ্ঞান ও দ্রাবিড়দের ভক্তিভাব দুইয়ের মিলনে ভারতের ধর্মভাব গভীর হয়। জাতপাত বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ধর্মেরই ফলশ্রুতি। যে ধর্ম যত উদার ও প্রেমভক্তিপূর্ণ তা তত বেশি জাতপাতমুক্ত। জাতপাত আলোচনাতে তাই ধর্মপ্রসঙ্গ টেনে আনা একান্তই দরকার। ধর্ম মত থেকেই সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম। সম্প্রদায় বা গোষ্ঠির উদ্ভব।

ভারতে মুসলিম বিজয়ের পরই দেখা দেয় হিন্দুবর্ণাশ্রম ধর্মের আরেক উজ্জীবনের চেষ্টা। সমাজব্যবস্থা যখন প্রায় জীর্ণদশাগ্রস্ত তখন মনুটীকাকার মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট, মিতাক্ষরা, টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর (১১ শ খৃঃ) চতুর্বর্গ-

চিন্তামণিকার হেমাদ্রি (১২৬০-১৩০০), বাংলার রঘুনন্দন প্রভৃতির চেষ্টা চলছিল, সমাজের পুরানো বন্ধনকে যেন আবার দৃঢ়বদ্ধ করা যায়।

এবার কয়েকটি সমন্বয়ধর্মী জাতপাতের ভেদহীন সম্প্রদায়ের কথা বলা যাক, যাঁরা কখনই কোথাও বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম ছায়ায় যাননি। বরং ভারতের মতো দেশে তাঁরা সবাই এক পথ দেখিয়েছেন, যা এ দেশের জাতিভেদের সমাধান করতে পারে, হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই সাম্প্রদায়িক মিলনগ্রন্থী হতে পারে। এই ধরনের কয়েকটি সম্প্রদায়ের খবর দিয়েছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে। যেমন হুসেনী ব্রাহ্মণ, হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। হিন্দুদের বিশ্বাস আচার ক্রিয়া কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মুসলমান ভাব ও ক্রিয়াকর্মের এক অপূর্ব মিশ্রণ এঁদের আচরণে লক্ষ্য করা যায়। এই সম্প্রদায় দাবি করেন তাঁরা ব্রাহ্মণ, তাঁদের বেদ হল অথর্ববেদ। অথর্ববেদে নাকি হিন্দু ও মুসলমান উভয় মতের সমন্বয় আছে

হিন্দু ও মুসলমান উভয় আচার এঁরা পালন করেন। রোজার দিনে উপবাস যেমন করেন,...আবার হিন্দুদের ব্রত উপবাসও করেন। এই হুসেনী ব্রাহ্মণ সমাজের নারীরা হিন্দুনারীর মত বেশ ভূষা ও সাধবার চিহ্ন ধারণ করেন। পুরুষরা ভিক্ষার সময় হুসেনের নাম ব্যবহার করেন।

ইমানশাহী সম্প্রদায়ের পুরোহিত বা 'কাকা' শ্রেণী কতকটা হুসেনী ব্রাহ্মণের মত। শাহদুল্লা সম্প্রদায়ের মানুষরাও অথর্ববেদের হিন্দু মুসলমান সমন্বয়াবতার 'নিষ্কলঙ্কে'র দোহাই দেন।

প্রেম ভক্তিধর্মের সাধকদের কাছে দুই ধর্মের উচ্চ আদর্শগুলির যেমন মিল আছে তেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে এক মিশ্র আচরণবাদের জন্ম হয়েছে। জাতপাতের অনুশাসন না মেনে, স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান না শুনে তাঁরা মিলিত হয়েছেন পাঞ্জাব শাহপুর জেলায় গিরোট তীর্থে। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। মুসলমানেরা জমালী সুলতানের ও হিন্দুরা দয়াল ভগবানের নামে সেখানে মিলিত হন।

মুলতানের শাম্‌স-ই-তবরেজ মন্ত্রবলে নাকি সূর্যতেজ ও অগ্নিকে আয়ত্ত করেন, এমন এক লোকশ্রুতি সেখানে আছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় দলের তীর্থযাত্রী সেখানে যান। মধ্যপ্রদেশের বাহাদুরপুরে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহম্মদ শাহদুল্লা এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাঁরা হিন্দু নয়, মুসলমানও নয়—উভয় সম্প্রদায়কে মিলনের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সম্প্রদায়ের নাম 'পীরজাদা'।

পীরজাদারা বলেন বিষ্ণুর দশম অবতার হলেন 'নিকলঙ্ক'—তিনি আমাদের উপাস্য।

১৮২৫ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে গুরু চামার ঘাসী দাস এক সম্প্রদায়ের প্রবর্তনা করেন। তাঁরা সৎনামী নামে পরিচিত। ছত্রিশগড় অঞ্চলে এঁরা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে খুবই প্রভাব বিস্তার করেন। এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা অধিকাংশই চামার শ্রেণীর। অধিকাংশই কৃষি শ্রমিক, গিরোড্, গ্রামেই এঁদের প্রধান বাসস্থান। ভারতের আর পাঁচটা হরিজন পল্লীর মত এঁদের গ্রাম ও সমাজজীবন। গিরোড্ ছিল আগে বিলাসপুরের মধ্যে, এখন রায়পুরে। ১৯০১ সালেই এঁদের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ। এই সৎনামী হরিজন সম্প্রদায় মাছ, মাংস মদ স্পর্শ করেন না। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। এঁদের মতে শ্রেষ্ঠত্ব চরিত্রে, ভক্তিতে ও পবিত্রতায়।

চামার জাতির আরেক সাধক ভক্তিধর্মে উচ্চবর্ণের জাতপাত-মানা সমাজকে অস্বীকার করেছেন, তিনি লালবেগ বা লালগির। নিজেকে অলখ্নামী বা অলখ্গিরও বলেন। দশনামী সম্প্রদায়ের মত এঁরা গিরি উপাধি ব্যবহার করেন। এই সম্প্রদায়ের সাধুরা আলখাল্লা ও টুপি পরেন এবং পরস্পরকে সম্ভাষণে 'অলখ কহো' বলেন। সব চাইতে বড় প্রতিবাদ বর্ণাশ্রম সমাজের বিরুদ্ধে এই অলখ-নামীদের, তা হল মন্দিরে যেমন প্রবেশাধিকার এঁদের নেই, তেমন এঁরা বলে মন্দির প্রভৃতি হীন স্থানে গেলে সত্যভ্রষ্ট হতে হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে লালবেগ ছিলেন প্রত্যক্ষ শিবস্বরূপ।

ইতিহাস শুধু নিপীড়ন আর শোষণের শেষ কথাই বলে না। অনেক সময় প্রতিরোধ, প্রতিবাদের সুরও ইতিহাসে প্রতিধ্বনির মত ফেরে। গাজীপুর-বালিয়া জেলায় এমন এক অন্ত্যজ লোকগুরু ভীখা, তাঁর শিষ্য গোবিন্দ সাহেব এবং এই গোবিন্দ সাহেবের শিষ্য পল্টু সাহেব। অনেকে পল্টু সাহেবকে বলেন দ্বিতীয় কবীর।

এই পল্টু সাহেবের কণ্ঠের প্রতিরোধ প্রতিবাদের স্বর আজও কি হরিজন নিপীড়িত গ্রাম ভারতে প্রতিধ্বনির মত ফেরে! —না, 'নীচ জাতিকে নষ্ট করিল উচ্চ জাতিরা, এবং নিজেরাও নষ্ট হইল। যে সত্যকে দেখিয়াছে তার আর দেশ-বিদেশ নাই। প্রত্যক্ষ সত্য বড় সত্য নহে, অন্তরে দেখা সত্যই বড়।...ভগবান কোনো সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি নহেন। জাতি-পঙ্ক্তির ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়।'

অন্ত্যজ পল্টু সাহেবের কণ্ঠস্বর মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক ও অভিন্ন 'যে মানবের মধ্যে দেবতাকে না দেখিল সে মন্দির হইতে দেবতাকে নির্বাসন দিল।' প্রতিবাদের ভাষায় এক যথার্থ ধার্মিকের প্রত্যয়ী সুর, যা কোন শাস্ত্রমানা ধর্মভীরু বর্ণাশ্রমী হিন্দুর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অস্পৃশ্যতার রাজনীতি

উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলায় এক ধাঙড় পরিবারে তার জন্ম হয়েছিল। চোখের সামনে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখেছে উচ্চবর্ণের ঘৃণা আর উপেক্ষা। বংশ-পরম্পরা ধরে তারা আবর্জনা পরিষ্কার করে আসছে। তারা অস্পৃশ্য, তাই তাই তাদের জন্যে নির্দিষ্ট মহল্লা। হরিজন টোলার বাইরের রাস্তা দিয়ে হাঁটলে, তথাকথিত উচ্চবর্ণের ছেলেদের চিৎকারের সাবধানবাণী শুনতে হয়,—'অচ্ছুৎ আসছে'। এমনকি তাদের ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করলে অশুচি হতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই সেই ছেলেটি, নাম তার হাজারি, হয়ে উঠেছে সমাজ-সচেতন। গ্রামের বাইরে এই ছেলেটিকে একদিন বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। এই দূষিত জাতপাতের আবহাওয়ার বাইরে, প্রায় সৌভাগ্যগুণে, সপরিবারে হাজারির বাবা সাহেবের বাড়ি চাকরি করতে বেরিয়ে পড়েছিল। দেরাদুন, মুসৌরি, সিমলা, প্রভৃতি শহরের শাদা চামড়ার সাহেবদের বাড়িতে বাবা-মা দুজনই চাকরি করত। মা কাজ নিয়েছিল আয়ার। বালক হাজারি তার ভাইবোনদের আগলাতো বাড়িতে। সকালবেলা জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখত ফুলের মত ফুটফুটে শিশুরা দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে।

কিছুদিন পরেই বালক হাজারির একটা চাকরি জুটে গেল। টেনিস ক্লাবে বল কুড়োবার কাজ। আর একটু বড় হবার পর হাজারি কাজ করতে লাগল। বিভিন্ন হোটেলে। একদিন নিজেদের বাড়িতে যে সব উচ্চবর্ণের মানুষ তাকে ঘৃণা করেছে, অস্পৃশ্য বলে তাড়িয়ে দিয়েছে, হাজারি দেখল তারাই হোটেলে বসে বিনা দ্বিধায় হাজারির হাত থেকে নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করছে।

শহরের সামাজিক জীবন অনেকটা বাধামুক্ত। তাই এখানে সবসময় জন্মের পরিচয়টা কাঁটার মত বিঁধত না হাজারির বুকে। তবু তারা দরিদ্র, তাই সব সমাজে তারা সম্মানহীন। দেখেছে মনিবের কাছে বাকি মাইনে চাইতে গিয়ে শাদা গেঞ্জিতে জুতোর দাগ নিয়ে বাবা ঘরে ফিরেছে। পুত্রের কাছে এই লাঞ্ছনা গোপন করতে কত ছলনার পথই না বাবা তখন নিয়েছে। হাজারির অভিজ্ঞতাও কিছু কম নেই। সারাদিন হোটেলে হাড়ভাঙা খাটুনির পর হয়ত

অবিক্রিত একটুকরো রুটি আর একটু চা যখন খাচ্ছে হঠাৎ মালিক এসে হাতের রুটি আর চা ফেলে দিয়েছে। চুরির অভিযোগে ক্ষুধার্ত হাজারিকে মারধোরও খেতে হয়েছে। হাজারির সৌভাগ্যে আবার অনেক সহৃদয় প্রভুও তার কর্মজীবনে এসেছে। তাদের উৎসাহে ও সাহায্যে লেখাপড়া শিখেছে কাজের ফাঁকে। এক বিদেশির অর্থানুকূল্যে উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিসও গিয়েছিল।

বিদেশে যাবার আগে তার জনমদুঃখী মা, বাবা ও অস্পৃশ্য ধাঙড় সমাজ সম্পর্কে এক মনোভাব তাকে পীড়িত করেছিল। যে সমাজে সে প্রবেশ করতে যাচ্ছে সেখানে তার পিতৃপুরুষের কোন পরিচয় নেই, সেখানে তার জন্মদাতা পিতামাতা পর্যন্ত অন্ত্যজ। হাজারির জীবনের অনেক ঘটনাই তারপর ঘটেছে। এক পরাধীন দেশের অস্পৃশ্য সমাজের যুবকের জীবনে সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য সমাজে কৃপা দাক্ষিণ্য পেতে যা যা তাকে করতে হয়েছে তাও এক অন্য উপাখ্যান। তবে হাজারির জীবনের কোন ঘটনাই গল্প কথা নয়, এ এক আত্মজৈবনিক আত্মকথা। বইটির নাম Autobiography of an Indian Out Caste'। বইটির ভূমিকা লিখেছেন মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মী পোলক।

অবশ্য গান্ধীজিকে হরিজন ও অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে যত বেশি সোচ্চার বলে মনে হয়, ঠিক তত বেশি সক্রিয় কি তিনি ছিলেন? প্রশ্নটি জাতপাত প্রসঙ্গে তখনই উঠতে পারে, যখন সমাজ জীবনে রাজনীতি এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। প্রাচীন সমাজে বিশেষত ভারতীয় সমাজ জীবনে ধর্ম ও শাস্ত্র একসময় রাজনীতির সহায়ক ছিল। তাই দেখা যায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজন্য, এই দুই বর্ণের মানুষের শাস্ত্রীয় অধিকারে খুব বেশি হেরফের নেই। বাকি দুই বর্ণ, বৈশ্য ও শূদ্রকে শাসন শোষণ করতে উচ্চ দুই বর্ণের বুদ্ধি ও বল সময় সময় আঁতাত তৈরি করেছে। আর্থিক ও সামাজিক সমস্ত অধিকার করায়ত্ত করেছে। তাই রাজনীতির ভূমিকা সে যুগেও ছিল।

রাজন্য ধর্মের এক বিচিত্র বৈপরীত্য ধরা পড়ে দক্ষিণ ভারতে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় সংস্কৃতভাষা ও আর্য সংস্কৃতির সম্প্রসারণ দক্ষিণের ম্লেচ্ছ দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হল। উত্তর দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রের রাজা, যিনি ম্লেচ্ছ রাজ বলে আর্য সংস্কৃতিতে ঘৃণ্য ছিলেন, পারলৌকিক শ্রাদ্ধকর্ম পর্যন্ত সে দেশে আর্যদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল। সেই অন্ধ্রের ম্লেচ্ছ রাজাই বর্ণাশ্রম ধর্মের বড় সংরক্ষক ছিলেন। শক ও যবনদের ধ্বংস করেন। তাই মনে হয় জাতপাতকে জিইয়ে রাখা

প্রাচীন যুগের ম্লেচ্ছ রাজাও রাজনীতির চাল হিসাবে সমর্থন করেছিলেন।

যাহোক, এখন জাতীয় কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধী ভারতের রাজনীতিতে জাতপাত অর্থাৎ অস্পৃশ্যতাকে কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন দেখা যাক। এই প্রসঙ্গে ডঃ অম্বেদকরের একটি সশ্রদ্ধ মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ডঃ অম্বেদকরের মতে '......he would insist on the removal of untouchability as precondition for entrance into Congress as he has insisted on thread-spinning as a precondition for voting in Congress' (Learning the use of Political Means/Caste in Indian Politics, Page 47.) অস্পৃশ্যতা নিয়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আখের গোছানোই কি ছিল গান্ধীজির উদ্দেশ্য? কারণ ডঃ অম্বেদকরের অস্পৃশ্য ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের দাবি বার বার গান্ধীজি অস্বীকার করেছেন। নিপীড়নের রাজনৈতিক প্রতিরোধ না করে হরিজন সমস্যার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দেশের ও জাতির সামনে গান্ধীজির এমন এক ভাবমূর্তি দীর্ঘদিন ধরে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল তৈরি করেছে যাতে মনে হয় তিনিই একমাত্র হরিজন নেতা ও পরিত্রাতা। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। হরিজন সেবক সংঘের এক গবেষকের অনুসন্ধান থেকে জানা যায় বেশ কয়েকজন হরিজন নেতা ডঃ অম্বেদকরের দলে দীর্ঘদিন থেকে হরিজনদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা জাগিয়ে তুলেছেন। উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজের গ্রামে হরিজন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ও তাদের কাছে কাজ না করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন হরিজন সেবক সংঘের কর্মীরা।

হরিজনরা ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে বর্ণাশ্রমী হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি জানিয়েছে ডঃ অম্বেদকরের নির্দেশে অনুন্নত শ্রেণীর এক সমাবেশে। নাগপুরে এই মহতী সমাবেশে যোগ দেন প্রায় ৭০,০০০ অস্পৃশ্য অন্ত্যজ মানুষ। বাংলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের নিপীড়ন আর অত্যাচারের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এমনকি তপশিলী জাতির জন্যে বর্ণহিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র গ্রামের দাবি পর্যন্ত ওঠে।

গান্ধীজি ও জাতীয় কংগ্রেস তখনও বিষয়টিকে সে ধরনের কোন গুরুত্ব দেননি, যা এই ক্ষোভকে কোন সামাজিক লক্ষ্য ও অধিকার লাভের পথ

দেখাতে পারে।

হরিজন সমাজ গান্ধীজিকে কীভাবে গ্রহণ করেছিল তার একটি ঘটনার উল্লেখ 'The Free press Journal'-এর সংবাদ থেকে জানা যায়। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সেরে বোম্বাইতে গান্ধীজি পৌঁছলেন। কংগ্রেস কর্মীরা তাকে বিপুল সংবর্ধনার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু হরিজন সমাজের ৮,০০০ নিপীড়িত মানুষ শিবতরকারের নেতৃত্বে গান্ধীজিকে কৃষ্ণপতাকা দেখিয়ে ফিরে যেতে বলেছিলেন। কেন গান্ধীজিকে হরিজন সম্প্রদায় গ্রহণ করতে পারেননি, তার কারণ অবশ্য স্পষ্টভাবে জানা যায় ডঃ অম্বেদকরের এক বিবৃতিতে—'গান্ধীজি গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের হরিজন বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের দাবি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন।'

গান্ধীজি ও জাতীয় কংগ্রেসের অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বা হরিজন আন্দোলনের আসল চেহারা ধরা পড়েছে ডঃ অম্বেদকরের 'Janata' পত্রিকায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পাদক এস এন শিবতরকারের এক প্রবন্ধে। তিনি এই প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, In spite of the fact that the removal of the untouchability has been included in the constructive programme of the Congress, practically nothing has been done so far by the body to achieve that object, and in our fights against untouchability at Mahad and Nasik most of the local congress leaders have been our bitter opponents.' এই তথ্যকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

গান্ধীজি ও ডঃ অম্বেদকরের নেতৃত্বের সংঘাতে শুরু হয় ভারতের অস্পৃশ্যতার রাজনীতির এক নতুন আবর্ত। অস্পৃশ্যতাকে সমাজ থেকে নির্মূল না করে, রাজনীতির খেলাতে এই দুই নেতা মেতে উঠলেন। অবশ্য এক সময় পর্যন্ত ডঃ অম্বেদকর অনেক বেশি আন্তরিক ছিলেন ভারতের অস্পৃশ্য সমাজের সমস্যা ও নাগরিক অধিকার লাভের দাবির প্রশ্নে। পরবর্তীকালে কংগ্রেসী রাজনীতি নেহরুর কূটনৈতিক চালে ডঃ অম্বেদকর হরিজন আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি মেতে ওঠেন সংসদীয় রাজনীতিতে। অবশ্য ইতিপূর্বে ডঃ অম্বেদকর কংগ্রেস ও গান্ধীজির অস্পৃশ্যতার রাজনীতি প্রসঙ্গে একটি বইও লেখেন. What Congress and Gandhi Have Done to the untouchable', কিন্তু স্বয়ং ডঃ অম্বেদকরের সুবিধাবাদী

রাজনীতিও এই বইটির আড়ালে মুখ লুকোতে পারেনি।

ভারতের স্বাধীনতার পর অনেক জাতীয় নেতার চরিত্রের মত ডঃ অম্বেদকরেরও আদর্শ ও কর্মে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার অল্প কিছু দিন আগেই ১৯৪৬ সালে অখণ্ড বাংলাদেশ থেকে শাসনতন্ত্র গঠন পরিষদের (Constituent Assembly) প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হন ডঃ অম্বেদকর। স্বাধীনোত্তর খণ্ডিত ভারতের খসড়া সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবেও ডঃ অম্বেদকরের নাম ছিল। নেহরু মন্ত্রিসভার প্রথম আইন মন্ত্রী হলেন ডঃ অম্বেদকর। এরপর হরিজন ও অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে তাঁর সুর পালটে গেল। তারপর অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে মন্ত্রিত্বের পর ১৯৫২ সালে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়ালেন ডঃ অম্বেদকর।

১৯৫১-৫২-র নির্বাচনে 'শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন' নিদারুণভাবে পরাজিত হল। স্বয়ং ডঃ অম্বেদকর পরাজিত হলেন দীর্ঘদিনের সঙ্গী চর্মকার প্রতিপক্ষের কাছে। এইভাবে শেষ হল অস্পৃশ্যতার রাজনীতির আরেক অধ্যায়। কিন্তু ভারতের জাতপাতের সমস্যা রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বার বার প্রকট হয়ে পড়েছে।

আমরা দক্ষিণ ভারতের নাদার গোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখতে পাব একসময়ে সে-সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে অস্পৃশ্য ছিল। সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার বঞ্চিত এই সম্প্রদায় আস্তে আস্তে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিগ্রহণ করে। ইংরাজ আমলে সরকার সমর্থক ও স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস ও সরকারের বড় স্তাবক এই সম্প্রদায় ভারতের অন্যান্য অস্পৃশ্য সমাজ থেকে বেশি প্রাধান্যলাভ করে। এক সময় কামরাজ নাদার প্রায় 'কিং-মেকার' হয়ে পড়েন রাজনীতিতে। কিন্তু এই নাদার সম্প্রদায় এতই হীন, অস্পৃশ্য ও সামাজিক অধিকার বঞ্চিত ছিল যে নাদার রমণীর উচ্চবর্ণের নারীর মত বক্ষ আবরণী দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না, স্বর্ণালঙ্কার, ছাতা প্রভৃতি ব্যবহারে কোন অধিকার ছিল না। উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট কূপ নাদারদের কাছে ছিল নিষিদ্ধ। তাহলে দেখা যাচ্ছে অস্পৃশ্যতার রাজনীতিতে অস্পৃশ্যতা নির্মূল করা মূল লক্ষ্য নয়, সম্প্রদায় বিশেষকে শাসকদলের পক্ষভুক্ত করাই বড় কথা।

ভারতে প্রাচীন যুগ থেকে এই অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ সম্প্রদায় যে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুসমাজের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত, তার উল্লেখ আমরা মেগাস্থিনিসের 'Indika' গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানতে পারি। একসময় আর্যাবর্ত

ম্লেচ্ছদেশ দ্বারা আচার আচারণ সংস্কৃতি ও ভাষায় কোথাও হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিল ছিল না এই ম্লেচ্ছ সমাজের। 'অমরকোষে' ম্লেচ্ছ জাতির তালিকায় কিরাত, পুলিন্দ ও শবর নামের উল্লেখ ছাড়া বিভিন্ন নিষিদ্ধবৃত্তিকে অস্পৃশ্য বলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' উপন্যাসে সমাজের উচ্চবর্ণের শাসন শোষণ, ও তাতমাটুলির ঢোঁড়াইয়ের জীবনই হল ভারতের হরিজন জীবনের প্রামাণ্য কথাচিত্র। গান্ধীবাদী সতীনাথ ভাদুড়ীও উপন্যাসে কংগ্রেসী নেতাদের অস্পৃশ্যতার রাজনীতির চেহারাটা স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিহারের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রের দিকে তাকালে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় জাতপাতের রাজনীতির আরেক রহস্য। বিহার এমন এক রাজ্য যেখানে উচ্চবর্ণের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সমস্ত জনবসতির ১৩·২২ শতাংশ বর্ণহিন্দু আর নিম্নবর্ণের মানুষ ৫২·১৬, অথচ সেই বিহারেই সব থেকে বেশি প্রভাবশালী সম্প্রদায় হল উচ্চবর্ণের মানুষ।

হরিজন নিপীড়নের অগ্রগামী রাজ্য বিহার। এই সেদিনও আরওয়ালে নৃশংসতম হরিজনমেদ যজ্ঞ হয়ে গেল স্বাধীন ভারতের পুলিশী গুলিচালনায়। এ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যটি উল্লেখ করছি অস্পৃশ্যতার রাজনীতির পরিণতি বোঝার জন্য, 'আরওয়াল, বলা দরকার কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিহারে বছরের পর বছর জমি ও ফসলকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত সংঘর্ষে শত শত দরিদ্র ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন হরিজন কৃষিজীবী প্রাণ হারান। কখনও আক্রমণকারীর ভূমিকায় দেখা যায় বর্ণহিন্দু বৃহৎ ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে—ভূমিহারদের ভূমিসেনা ও যাদবদের লোরিকসেনা। সারা দেশের মধ্যে বিহারই একমাত্র রাজ্য যেখানে অকৃষক ভূস্বামীদের এই ধরনের সশস্ত্রবাহিনী পুষিতে দেওয়া হয়। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪,৫,৮৬)

আরওয়াল, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ প্রায় জায়গায় হরিজন নিপীড়নের অলাতচক্র আবর্তিত হচ্ছে। আরওয়ালের ভরত সাহুর স্ত্রী পুত্রের চোখের জল শুকোতে না শুকোতে আবার কোন হরিজনটোলায় আর্তকান্না জেগে ওঠে। ভারতের রাজনীতির দাবার ছকে রাজা, মন্ত্রী, গজের মত অস্পৃশ্যতাও একটি ঘুঁটি, কী জানি কে কোন চাল চালে।

অস্পৃশ্যতার রাজনীতি : সমকালীন সংবাদপত্রের দর্পণে

সমাজে উচ্চবর্ণের দাপট, অত্যাচার ও শোষণ আজও সমানভাবে ভারতীয় সমাজ জীবনে অপ্রতিহত আছে। রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন ও পুলিশ কার কি ভূমিকা তা এই সাম্প্রতিককালের ঘটনাগুলিতে পরিস্ফুট হয়েছে সংবাদপত্রের দর্পণে।

তপসীলীজাতি, উপজাতি ও হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষের আক্রমণের ঘটনা আবার বাড়তে থাকায় কেন্দ্র উদ্বিগ্ন। কী করে সমাজের এই সব পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করা যায়, সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আবার নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন।

গত বছর সারা দেশে তথাকথিত উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের আক্রমণে ৫৪০ জন তপসীলী জাতি ও উপজাতি নিহত হন। আহতের সংখ্যা ১৪০০-রও বেশি। এই সব আক্রমণের কারণ ও কোন পরিপ্রেক্ষিতে তা সংঘটিত হল সে নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে সমীক্ষা করা হচ্ছে। গত বছর এই সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের যে সব ঘটনা ঘটে সেগুলি নিয়ে এক সমীক্ষা চালানো হয়। তাতে দেখা গেছে তপসীলী জাতি ও উপজাতি নিগ্রহের ঘটনা যে সব রাজ্যে বেশি হয়েছে, তাদের প্রায় সব কটিই কংগ্রেস শাসিত। বিভিন্ন রাজ্যে এই সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা ও ঘটনার হার বিচারে দেখা যায় তালিকার সবার ওপরে স্থানে পাচ্ছে মধ্যপ্রদেশ। আর সবার নিচে আসাম ও ত্রিপুরা। পশ্চিমবঙ্গের স্থানও একেবারে তলার দিকে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে তফসীলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা এক কোটি বারো লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস যে রাজ্যে সেখানে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা মাত্র আঠারটি। ত্রিপুরায় এই সম্প্রদায়ের সংখ্যা তিন লাখ। এবং সেখানে গত বছরে একটিও অত্যাচারের ঘটনা ঘটেনি। আসামেও কোন ঘটনা ঘটেনি জনসংখ্যার হার ও অত্যাচারের ঘটনায় মধ্য প্রদেশের পরেই স্থান রাজস্থানের। মধ্যপ্রদেশে ৭৪ লাখ তপসালী জাতি ও উপজাতি মানুষের বাস। গত বছর সেখানে ৫৫০০টি অত্যাচারের ঘটনা ঘটে। রাজস্থানে এই সম্প্রায়ের মানুষ রয়েছেন ৫৮ লক্ষ সেখানে অত্যাচারের

ঘটনার সংখ্যা ১৬০০। তপসীলী জাতি ও উপজাতি সবচেয়ে বেশি রয়েছেন উত্তর প্রদেশে ২ কোটি ৩৪ লাখ। সেখানে অত্যাচারের ঘটনা ৪২০০টি। এক কোটি তপসীল জনসংখ্যা বিশিষ্ট বিহারে অত্যাচারের ঘটনা ১৮০০। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওই সমীক্ষায় দেখা যায়, তপসীলী জনসংখ্যার বিচারে অপরাধের তালিকায় প্রথম দশটি রাজ্যের মধ্যে দশম স্থানটি অন্ধ্র প্রদেশের। প্রথম দশটি রাজ্যের ক্রমপর্যায় এই রকম (১) মধ্য প্রদেশ (২) রাজস্থান (৩) গুজরাট (৪) বিহার (৫) উত্তর প্রদেশ (৬) মহারাষ্ট্র (৭) তামিলনাড়ু (৮) হিমাচল প্রদেশ (৯) হরিয়ানা (১০) অন্ধ্রপ্রদেশ।

Kansara Victims Unwilling to return home

From Mohan Sahay

KANSARA, July 15.—The landless Harijans and members of other weaker sections continue to flee their villages in this part of Jehanabad sub-division after last week's carnage in which 10 people were killed here by the local landlords. Despite the presence of Central Reserve Police Force and a flurry of activity in the area as the senior officials and Ministers are visiting the place, the Government has failed to instill confidence among those who have left their homes.

Even after the visit of the Chief Minister, Mr Bindeswari Dubey, today to this village and the so-called relief camp being run in a school, the terror-stricken men, women and children refuse to return to their homes.

Krishna Ram, who lost his aged father and mother in the shoot-out, told this correspondent here today : "We would rather perish here (in the relief camp) than go back to our homes". Others nodded in agreement with Krishna Ram who was luckily away from the village when the raiders attacked the kahars.

Besides the 150-odd affected people who are living in Pariar Bazar school there are another 200 people who have came from Gantari village. The landless labourers of the neighbouring Majitpur village too have left their place fearing another attack by the all powerful landlords.

While half of the school building has been occupied by the

police and the officials running the camp, hundreds of men, women and children are living in the open. Rooplal Kumbhar of Majitpur said : "We sleep in the field of the school." Even though the Chief Minister was to visit the camp there was no sign of any tent or thatchet roof for the hapless villagers who could be seen cooking their meals in the open. What was shocking was the revelation made by the womenfolk of Majitpur village and Gantari village that "we are not getting any ration from the Government". They were cooking with whatever little foodgrain they could carry with them while fleeing the village. The Government ration is being supplied only to the residents of Kansari village the scene of the shoot-out. And one is really surprised to learn the quantum of the ration being given to the refugees of Kansara—one kg of wheatflour for five adult members a day. During the past one week since the refugees have been living in the camp they were supplied rice only once that too in a meagre quantity. One kg of vegetables was given only once that too for ten people.

As the jeehs zoomed past the road with police officials, the senior Government staff were busy erecting a shamiana on the school campus for the Chief Minister to address the camping labourers.

Asked why they were reluctant to return to their village, the labourers said : "The landlords would kill us". What about their land and other belongings ? The reply was "We do not have any land. We work on the farm of the landlords."

All the victims of the carnage used to work as labourers on the field of the landlords while the womenfolk were doing what they called "haveli work in the landlord's house". "We are not even remotely connected with the murder of the land-

lord Vijay Sharma. How could we kill our master ?" they asked. But one thing that the villagers admitted was that they were all sympathizers of the Left-wing Kisan Mazdoor Sangram Samiti.

According to eyewitness accounts, hardly one hour after some five unknown assilants had slain Vijay Sharma in a tea stall in Imamganj just five km away from Kansara, the landlords attacked the Kahars. The bodies of two chiddren have not been recovered so far. According to one villager living in the camp the children after being shot were packed in a bamboo basket and dumped in the rivulet.

It is now confirmed that the police arrived in Imamganj where Vijay Sharma was slain only after five and a half hours of the incident. The superintendent of police, who visited Imamganj, was not aware until after 24 hours of the killings in Kansara which is just five km away from Imamganj. And the Bihar Government had no inkling of the shootout until after 48 hours of the incident.

Adivasi-landlord rivalry led to Maharashtra deaths

From Our Special Representative

BOMBAY, March 31 :—With killing of five Adivasis in the remote tribal village of Shelti in Dhule distrect of north Maharashra on Holi day the simmering tension in the area came to a head. The Adivasis are increasingly becoming aware

of their rights and the prosperous farmers economic and social interests are being directly affected by the tribal movement.

The Shelti killing in which nearly 500 farmers raided the the tribal village in tractor, trollies and jeeps and mercilessly beat men women and children, was preceded by clashes over the past few years. in which the Adivasis invariably had to bear the brunt of landlord violence.

The provocation for the killings was flimsy. Stealing logs, wood, has and discarded pieces of wood to light the Holi bonfire is an accepted practice in Maharashtra. On that day, two Adivasi boys of Shelti had picked up some hay from the compound of a Gujar landrod leading to a quarrel. The elders from the two communities pacified the boys. The Adivasi elders also made apologies. After the Holi festivities were over, the Adivasis retired for the night.

After midnight, a armed group carrying spears. iron rods and gharis, a sharp steel weapon, marched on the Adivasi locality, shouting slogans. They demolished huts, beat up women and children and chased those who tried to flee into the nearby basin of the river Tapi. Five men were killed and more than a dozen seriously injured. The attackers even buried alive a tribal, Raisingh....

ইস্তফা : রাজীবকে রামধনের চিঠি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন—এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক পদে ইস্তফা দিয়ে রামধন প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতি রাজীব গান্ধীকে যে চিঠিটি লিখেছেন, তার মূল বক্তব্য হল : হরিজন এবং উপজাতীয়দের দাবিদাওয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। তার প্রতিবাদেই তিনি ইস্তফা দিচ্ছেন। তথ্যাভিজ্ঞ সূত্রে একথা জানা গেছে। রামধন লিখেছেন, বিদায়ী রাজ্যসভা সদস্যদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের হরিজন সদস্য ছিলেন তিনজন। কিন্তু দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে মাত্র একজন হরিজনকে দলের টিকিট দেওয়া হয়েছে। ওদিকে বিহার থেকে কোনও হরিজন বা উপজাতীয়কে দলের টিকিটই দেওয়া হয়নি।

হরিজন ও উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে বিধান পরিষদ এবং রাজ্যসভার দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে কংগ্রেস পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রার্থী মনোনীত করেনি—এই প্রতিবাদেই রামধনের ইস্তফা। রামধন তাঁর চিঠিতে লোকসভা এবং বিধানসভাসমূহে তপসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, রাজ্যসভা এবং বিধানপরিষদসমূহের ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হয়নি। রামধন লিখেছেন, যদি এই ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে বিভিন্ন দলের হরিজন ও উপজাতীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে এই দাবি ওঠার সম্ভাবনা আছে।

তথ্যাভিজ্ঞ সূত্রের মতে, রামধনের ইস্তফা দেবার সঙ্গে কোনও বিক্ষুব্ধ নেতার সম্পর্ক নেই। ইউ. এন. আই.

Harijans killed

Patna (PTI) At least four members of a Harijan family were killed by an armed group in Babani village under Jehanabad police station on Monday night, according to Mr G. Narayan, IG (administration). He told newsmen here on Wednesday that two senior police officials had rushed to the spot. Details were awaited, Mr Narayan said.

Tribals face starvation in Krishnanagar

From Our Correspondent

KRISHNANAGAR, Feb. 8.—Most of the 250 tribal families at Gorali and in its adjacent areas in the Haringhata block do not get two square meals a day and some are faced with starvation. The people, most of the Oraon, Bhumij and Badia communities, have forsaken their major traditional habits, customs and dialects.

Ninety per cent are landless agricultural labourers. They have virtually no work as the harvest of aman paddy ended in December. A few, however, get low-pay jobs. To avoid starvation, some are selling their goats, pigs, hens and cows. "The tribals do not beg. What else will they do under the circumstances ?" said a tribal social worker.

The condition of Mr Hazra Sardar, Mr Kali Sardar, Mr

Shyam Sardar, Ms Manibala Sardar and Ms Sundari Sardar is pitiable. Mr Shyam Sardar's wife has been ill for a long time. He cannot afford medical treatment for her. His eldest son, Niranjan, studying in class VII, has now to go out in search of work. Some residents of the neighbouring areas are said to be less than kind to the tribals. About two years ago, Kesto Sardar was beaten to death by some people of a neighbouring locality. No action has so far been taken against the offenders, it is alleged.

Visiting the area, one gets the impression that an attempt was made to uplift these tribals but the programme was given up subsequently for reasons best known to the State Tribal Welfare department. A welfare centre, Gorali Adibashi Tapashali Kalyan Kendra, was established more than 15 years ago. There was a granary too. The welfare centre is now dilapidated. Doors and windows are broken down, three old chairs, a bench, a table and an almirah are left in a room. The social welfare worker posted there has been withdrawn.

গ্রন্থঋণ

১। হিন্দু সমাজের গড়ন/নির্মলকুমার বসু

২। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)/নীহাররঞ্জন রায়

৩। ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন/অশোক রুদ্র

৪। তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন/সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। ভারতের মধ্যযুগের সাধনার ধারা/ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

৬। মনুসংহিতা/পঞ্চানন তর্করত্ন

৭। রামায়ণ/রাজশেখর বসু

৮। মহাভারত/রাজশেখর বসু

৯। উপনিষদ/উদ্বোধন

১০। ভারতের পুনর্গঠন/স্বামী বিবেকানন্দ

১১। কালান্তরের পথিক রোমা রোঁলা/প্রমোদ সেনগুপ্ত

১২। সাহেবধনী সম্প্রদায় তার গান/সুধীর চক্রবর্তী

১৩। দর্শনের ইতিবৃত্ত/মনোরঞ্জন রায়

১৪। চাকদহ কলেজ পত্রিকা লালন সংখ্যা

১৫। সমাচার দর্পণ/৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯

১৬। আনন্দবাজার পত্রিকা

১৭। Ancient Indian Social History/Romila Thapar

১৮। Caste in Indian Politics/Edited by Rajni Kothari

১৯। Journal of the Asiatic Society (vol XXVII, No 1)

২০। What Congress and Gandhi Have Done to the untouchable/Dr Ambedkar

২১। Studies in Indian Social Polity/Dr Bhupendra Nath Dutta.